অনুজ

দেবপ্রসাদ ও আদিত্যকে

এই গ্রন্থে একত্রিত গল্পগুলি তিনটি পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল—পাঁচটি দিল্লীর সাহিত্য-পত্রিকা "ইন্দ্রপ্রস্থে"। বলা বাহুল্য, সব কাহিনী ও চরিত্র সম্পূর্ণ কাল্পনিক, কোনও বাস্তব ব্যক্তির সঙ্গে নিঃসম্পর্ক। মাথ্যু আর্নল্ড বলেছিলেন, সাহিত্য জীবনের সমালোচনা। এ গল্পগুলিও সমসাময়িক ভারতীয় জীবনের সাহিত্যিক সমীক্ষা। এক সঙ্গে পড়লে, কয়েকটা মোদ্দা রেখা ধরা পড়বে।

চাণক্য সেন

বিরাট পাহাড় ঃ বিশীর্ণা নদী

জার্মান নাগরিক হাইন্‌রিক স্ম্যাট্‌জ্‌ কয়েক বছর ছিল ভারত-প্রবাসী। যাবার আগে নিয়ে গেছে বুকে ক'রে ভারতবর্ষের এক টুকরো রহস্যময় ছায়া। তার কথা আপনাদের বলি।

ওর একটা চিঠি এসেছে কলোন থেকে ক'দিন আগে। অনেক গুরু-গম্ভীর বক্তব্যের পরে চিঠির শেষপ্রান্তে লিখেছে, সুজাতার বিয়ের খবরে সুখী হলাম। ওর ঠিকানা দাও নি, তাই অভিনন্দন পাঠাতে পারলাম না। দেখা হ'লে বোলো, আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল তার নতুন জীবনে।

সুজাতাকে বলেছিলাম। সে আমার সহকর্মিনী, এক কলেজে। নতুন-পাওয়া স্বামীর প্রেমে ডগমগ হ'য়েও মুহূর্তের জন্যে সুজাতা একটু উদাস হল। তারপর স্বভাব-সুলভ দুষ্টুমি চোখে এনে মৃদু হেসে বলল, "আপনার মারফৎ আমিও একটা বাণী পাঠাবো নাকি ?"

"রক্ষে করো। দৈত্যের দৌরাত্ম্য আমার দুঃসহ।"

"ঐ দেখুন! শুরু করলেন আপনার দাঁত-ভাঙ্গা বাংলা। আমি একটা মোলায়েম জবাব আশা করেছিলাম।"

আপনারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে অনেক কিছু ভেবে নিয়েছেন। ভেবেছেন হাইন্‌রিক ও সুজাতার গভীর প্রেম হয়েছিল। হয়তো ভেবেছেন, হাইন্‌রিক বিয়ে করতে চেয়েছিল সুজাতাকে, সুজাতা রাজী হয় নি, আর হাইন্‌রিক মনের দুঃখে বনে, অর্থাৎ কলোনে, গেছে। কিম্বা হ য়তো ভেবেছেন, সুজাতাই ধপাস ক'রে হাইন্‌রিক স্ম্যাট্‌জের ভালোবাসায় পড়ে গিয়েছিল, বেচারা পালিয়ে বেঁচেছে।

এসবের কোনওটাই কিন্তু হয় নি। হয়নি বলেই তো কাহিনী! যা হয় তা ফুরোয়। যা হয় না, তা রয়।

আপনাদের মধ্যে সুরুচি সুভদ্র যদি-বা কেউ থাকেন, হয়তো বলে উঠবেন, কেন বাবা, এসব ব্যক্তিগত ব্যাপারের মধ্যে যাওয়া। তোমার হাইন্‌রিক স্ম্যট্‌জ্‌ জার্মান, আমাদের সুজাতা বসু বাঙ্গলী। জীবনের পাকচক্রে তাদের মধ্যে কী হল, বা না হল, তা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা কেন?

মুজতবা আলি হ'লে বলতেন, হক্ কথা। কিন্তু কি জানেন, কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে যদি মাথা না ঘামান, তাহলে সকাল-সন্ধ্যা আপনার মাথা ধরবে, এবং প্রসঙ্গত, গল্প-উপন্যাস রচিত হবে না। সুতরাং হাইন্‌রিক-সুজাতা-সংবাদ পাঠ করুন, হয়তো এক-আধবার চমক লাগতেও পারে।

তার আগে, আসুন, হাইন্‌রিক স্ম্যট্‌জের একটু পরিচয় দি। হঠাৎ দেখলে মনে হয় পালোয়ান। যেমন লম্বা, তেমনি চওড়া। মাথায় বেশ চকচকে গোল টাক, চতুর্দিকে পাতলা লালচে চুলের হাল্কা বেড়া। প্রশস্ত ললাটে চিন্তাশীলতার গভীর রেখা। চোখ নীল, দু'টুকরো শরতের আকাশ; নাকটা আচমকা চাপা, চওড়া চোয়াল, চ্যাপ্টা চিবুক। সুদর্শন নয়, কিন্তু বিরাট দেহে ব্যক্তিত্বের গম্ভীর ব্যঞ্জনা। মনোমত পরিবেশ পেলে গল্প করতে ভালোবাসে।

ভারতবর্ষে এসেছিল সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-প্রসারের কোনও একটা প্ল্যানের পরিচালক হ'য়ে। কলোন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রত্নতত্ত্বের অধ্যাপক। না, ঠিক চাকরী নিয়ে আসে নি। দুবছরের প্ল্যান কার্যকরী করবার দায়িত্ব নিয়ে এসেছিল। আপিস ছিল দিল্লী সহরেই, কিন্তু আসল কাজ বিহার ও মাদ্রাজে, মাটির নীচে। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্বের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে মাটির গর্ভ থেকে হারিয়ে-যাওয়া অতীতকে টেনে বার করতো। আট-দশটি ছেলেমেয়ে নিয়ে দুমাস ঘুরে চলতো অতীত অন্বেষণ। ফিরে এসে দিল্লীতে মাসখানেক কাটিয়ে আবার নতুন দল নিয়ে বেরিয়ে পড়তো।

আমার সঙ্গে বন্ধুত্ব হ'ল প্রথম সাক্ষাতে। প্রত্নতত্ত্বে নিরাগ্রহ

আমি ; পাথর আমার কাছে নীরব ; হাইন্‌রিকের কাছে অত্যন্ত সরব, সঙ্গীতময়। এক বন্ধুর অনুরোধে হাইন্‌রিকের ফ্‌ল্যাটে হাজির হয়েছিলাম এক গ্রীষ্ম সন্ধ্যায়। গলফ্‌ লিঙ্ক-এ সাজানো-গোছানো ফ্‌ল্যাট, যদিও হাইন্‌রিক একা মানুষ, এবং প্রায়ই বাইরে থাকে। শোবার ঘর, বসবার ঘর ; একটা ঘরে হাইন্‌রিকের ব্যক্তিগত দপ্তর। তাছাড়া খাবার ঘর আছে, বেশ বড় একটা বারান্দা আছে, এবং ঘন-সবুজ লন আছে। হাইন্‌রিক আমাদের শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত দপ্তর-ঘরে বসাল। মাঝখানে বড় সেক্রেটারিয়েট টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, আর সর্বত্র নানা ধরনের পাথরের মূর্তি, ফলক, লিপি, এবং আমার কাছে বোবা, অর্থহীন, ছোট-বড় প্রস্তরখণ্ড। ঘরটা ছোট-খাট মিউজিয়ম।

আমার পাথর দেখে একঘেয়ে, কিন্তু মানুষটাকে কেমন ভালো, লাগল। একে তো অমন জাঁদরেল চেহারার পুরুষ বড় একটা দেখা যায় না (দিল্লীতে, লক্ষ্য করে থাকবেন, জাঁদরেল স্ত্রীলোকের সংখ্যা অনেক বেশি, পুরুষগুলি সবাই কেমন মিনমিনে, দপ্তরে বড়কর্তা, বাড়ীতে স্ত্রীশাসনে ক্ষীণপ্রতাপ) ; তাছাড়া মানুষটার মুখে-চোখে প্রচ্ছন্ন সরলতা আমাকে সহজে আকর্ষণ করল। টেবিলের ঠিক ওপরে বড় ল্যাম্প-সেডে চড়ুই পাখি নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছে। আমার নজর পড়তে হাইন্‌রিক ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল। বলল, "ঘরে পাখির বাসা শুভকরী, আমার মা বলতেন। ক'দিন আগে চারটে ছানা হয়েছে। রোজ সকালে মা ওদের উড়তে শেখায়।"

আমরা বিয়ার খেতে খেতে গল্প করছিলাম। আমার বন্ধু দর্শনের অধ্যাপক, সুতরাং ভারতবর্ষের মাহাত্ম্য প্রচার করতে ভালবাসেন। তিনি হাইন্‌রিককে বোঝাচ্ছিলেন ভারতবর্ষ কিসে কতো বড়, য়ুরোপকে কোন কোন ক্ষেত্রে তার অনেক দেবার আছে।

হাইন্‌রিক নীরবে শুনছিল। ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা তার অসীম, সে অতীত তার কাছে বাঙ্ময়। রোজ সে তার

কথা শোনে, তার ডাকে ছুটে যায় সুদূর বিহার ও মাদ্রাজ, মাটি খুঁড়ে সে অতীতকে উদ্ধার করে। ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যের কথা শুনতে তার ক্লান্তি নেই। কিন্তু দার্শনিক মাত্রেই ক্ষীণদৃষ্টি, এবং আমার বন্ধুও তাই; তিনি উত্তেজিত বক্তৃতার জের টেনে আনলেন অতীত থেকে জলজ্যান্ত বর্তমানে, এবং প্রমাণ করতে লেগে গেলেন ভারত, তার অদলীয় পররাষ্ট্রনীতি, প্রজ্বলিত গান্ধীবাদ ও চমৎকারী গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্র নিয়ে বিশ্বের দরবারে কতখানি মহান। আমি দেখতে পেলাম হাইন্‌রিকের প্রকাণ্ড মুখখানায় একটা প্রচণ্ড হাই রেখাপাত করছে।

দার্শনিক বন্ধুর দর্শনে এ-সব সামান্য জিনিষ আসার কথা নয়। তিনি বলে চললেন ভারতবর্ষ নির্লোভ তাই সে সবাকার সাহায্য পাচ্ছে; ভারতবর্ষ কারুর নেতৃত্ব করতে নারাজ, তাই শক্তিমান দেশগুলি বিপদে পড়লে বার বার তার শরণাপন্ন। য়ুরোপ-আমেরিকার কোলাহলমুখর সভ্যতার বাইরে ভারত তার নিজের মাহাত্ম্যে সোজ্জ্বল, দারিদ্র্য নিয়েও বিত্তবান, ক্ষুধা সত্ত্বেও পরিতৃপ্ত, অভাব নিয়েও পরিপূর্ণ।

হাইন্‌রিক দু'বোতল বিয়ার শেষ ক'রে তৃতীয় বোতল খুলতে খুলতে প্রথম মুখ খুললো। বললো, "আপনি যা বলেছেন সব ঠিক, ডাঃ পাল। তবে, ব্যবহারিক জীবনে আমাদের অভিজ্ঞতা একটু আলাদা।"

উৎসাহ পেয়ে প্রশ্ন করলাম, "আপনার অভিজ্ঞতাটা একটু বলবেন?"

হাইন্‌রিক একগাল হাসলো। "সামান্য অভিজ্ঞতা", বলল আস্তে আস্তে। "শুনতে চান বলতে পারি। তবে, এমন কিছু নয়। এবং, কিছু মনে করবেন না।"

আমি বললাম, "সামান্যতেও অনেক বড় কিছু খুঁজে পাওয়া যায়। স্পষ্ট ক'রে বলুন, মনে করার মতো মেয়েলি মন আমাদের নয়।"

হাইন্‌রিক জবাব দিল, "তা বোধহয় ঠিক নয়। আপনারা বড়

সহজে বেশ কিছু মনে ক'রে বসেন। কোনও বিদেশী আপনাদের দেশ নিয়ে সমালোচনা করলে বড্ড সহজে চটে যান।"

আমার চট ক'রে ক্যাথারিন মেয়ো থেকে বিভরলি নিকল্‌স্‌ মায় জর্জ ক্যাম্বেল পর্যন্ত মনে পড়ে গেল। মনে পড়লো, ফষ্টারের 'প্যাসেজ টু ইণ্ডিয়া' নিয়েও আমরা গুমরে মরেছি।

একটু লজ্জা পেয়ে বললাম, "অভিযোগ মেনে নিচ্ছি। আমরা হলাম নতুন অনুরাগী যুবতীর মতো। সামান্যেই অভিমান ক'রে বসি। কিন্তু, কথা দিচ্ছি, আপনার স্পষ্টভাষণে প্রীত হব।"

হাইন্‌রিক স্যুট্‌জ্‌ হাসিটি বজায় রেখে বলল, "আমার বক্তব্য এমন কিছু নয়। এখানে এসে একটা ভ্যালেট জাতীয় লোকের দরকার হল। আপনাদের দেশে মানুষের দাম কম, তাই মানুষ সহজে মানুষের সেবা কিনতে পারে। কয়েকটি লোক এল কর্মপ্রার্থী হ'য়ে, তার মধ্যে যার পকেটে সবচেয়ে বেশি প্রশংসাপত্র ছিল তাকে নিযুক্ত করলাম। বছর ত্রিশ বয়স হবে, শিখ সর্দার, চমৎকার চেহারা। বেশ সুন্দর ভুল ইংরেজী বলে, কথায়-বার্তায়, কাজে-কর্মে, ত্রুটিহীন। একা মানুষ আমি, ওর হাতে টাকা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এমনি ক'রে মাস ছ'য়েক কাটল। প্রথম দিকটায় দিল্লীতে থাকা হত বেশি; এর মধ্যে মাস চারেক এখানেই ছিলাম। একদিন হঠাৎ ভ্যালেট মশাই কাজে ইস্তফা দিলেন। বললেন, দেশে যাবার জরুরী তলব এসেছে। অনুরোধ করতে আমি একটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র লিখে দিলাম। সে বিদায় হবার দু'দিন পরে একজন লোক এসে হাজির। কি ব্যাপার? না, আমার কাছে রুটি, ডিম, মাখন ইত্যাদির জন্যে পঞ্চাশ টাকা পাওনা। সে কি? সন্তোখ সিং তো সবই নগদে কিনেছে? সে বলল, আজ্ঞে না, বহুদিন সে এক পয়সাও দেয় নি। তবে আপনি বাকী জিনিষ দিয়ে গেছেন কেন? চোখ বড় বড় ক'রে লোকটি বলল, "সে কি কথা! সাহেবের কাছে টাকা থাকাও যা, ব্যাঙ্কে রাখাও তাই।" আশ্চর্য হলাম। তার পঞ্চাশ টাকা আমার কাছে 'ব্যাঙ্কে'

আছে! এর পরে এলো মুদি, মাংস-ওয়ালা, মায় মদের দোকান থেকে প্রতিনিধি। সর্বসমেত শ' তিনেক টাকার জিনিষ সন্তোখ সিং কিনেছে, একটি পয়সাও দেয় নি।"

আমি অবাক হ'য়ে বললাম, "আপনি কি করলেন?"

"কি আর করবো? সন্তোখ সিং-এর সন্ধান ক'রে সন্তোষজনক কিছু নিশানা পেলাম না। টাকাগুলি দিয়ে দিলাম।"

"অবশ্য এই একটা ব্যাপার দিয়ে আপনি আমাদের বিচার করতে পারেন না," দার্শনিক বন্ধু প্রতিবাদ করে উঠলেন।

"নিশ্চয় না," মানল হাইন্‌রিক স্ম্যাট্‌জ্‌। "কিন্তু গল্পটা পুরো শুনুন। মাস দুই পরে আমি ফিরে এসেছি এখানে, এবং সৌভাগ্যক্রমে, আর একটি চাকর পেয়েছি। একদিন এক পুলিশ অফিসর এসে হাজির। অবাক হলাম, আমি পলাতক ওয়ার-ক্রিমিনাল নই। নাৎসী জেলে কাটিয়েছি পুরো পাঁচ বছর। কিন্তু পলাতক ওয়ার-ক্রিমিনাল হ'লেও ততোটা আশ্চর্য হতাম না যতোটা হলাম পুলিশ অফিসারের অভিযোগ শুনে। সন্তোখ সিং নামে এক ভারতীয় নাগরিক থানায় গিয়ে নালিশ করেছে পুরো ছ'মাস আমি তাকে মাইনে দিই নি!"

হাইন্‌রিক স্ম্যাট্‌জ্‌ কথাগুলি বলছিল হেসে হেসে, একটুও রাগ বা তিক্ততা না দেখিয়ে। মনে হচ্ছিল সে পুরোপুরি উপভোগ করছে আমার দার্শনিক বন্ধুর অস্বস্তি।

আমি বেশ মজা পেয়ে বললাম, "বুদ্ধিমান লোক বটে আপনার সন্তোখ সিং। কূটনীতিতে হাত পাকালে রাষ্ট্রদূত হ'ত। প্রতিরক্ষার সবচেয়ে বড় পন্থা আক্রমণ।"

হাইন্‌রিক হাসতে হাসতে বলল, "তখন একটু রেগে গিয়েছিলাম। কিন্তু পরে মনে হল সাবাস লোক। টুপি তুলে সম্মান দেখানোর উপযুক্ত।"

দার্শনিক বন্ধু ঘোষণা করলেন সন্তোখ সিং ভারতীয় সমাজের প্রতিনিধি নয়।

হাইন্‌রিক একবাক্যে মেনে নিল। "নিশ্চয় নয়। সন্তোখ সিং তো নয়ই, এমন কি ডাক্তার স্থবেদারও নয়।"

"ডাক্তার স্থবেদারটি আবার কে হ'ল ?" আমি প্রশ্ন করলাম।

"একজন স্থচিকিৎসক। এখানে আসবার পরেই আমার জ্বর হ'ল। হঠাৎ আবহাওয়া পরিবর্তনে গলায় ব্যথা হ'য়ে সামান্য জ্বর। একজন নতুন-চেনা আমেরিকান বললে, স্থবেদারকে ডাকো। এ পাড়ায়ই স্থবেদারের ক্লিনিক, তাতে আরও স্থবিধে। স্থবেদার এল এবং খ্যাচ ক'রে আমার দেহে সূঁচ ফুটলো। তিনটে ইনজেকসন দিয়ে বিল পাঠাল সত্তর টাকার।"

"বলেন কি ?"—এবার দার্শনিক বন্ধুও আঁৎকে উঠলেন।

"তিনদিনের ভিজিট ষাট টাকা, ওষুধের দাম দশটাকা!"

"এ যে রাহাজানি!"

"আমি তখন কিছুই বুঝিনি। টাকাটা দিয়ে দিলাম। পরে আর একটি জার্মান ভদ্রলোকের কাছে শুনলাম ডাঃ স্থবেদারের ভিজিট পাঁচ টাকা। নতুন বিদেশী পেয়ে চারগুণ আদায় করেছে।"

দার্শনিক বন্ধু এবার রীতিমত বিব্রত হ'লেন। হাইন্‌রিক উঠে এসে তার পাশে বসল। বলল, "ডাঃ পাল, আপনি লজ্জা পাবেন না। বিদেশীদের সবাই এক-আধটু ঠকাতে চায়। আপনাদের দেশে এ প্রকৃতিটা হয়তো একটু বেশি। আমরা প্রত্যেক পদে ঠকবার জন্যে তৈরী হ'য়ে আছি। ট্যাক্সি-ওয়ালা আমাদের ঘুর-পথে নিয়ে গিয়ে বেশি টাকা আদায় করে, দোকানী আমাদের দেখলে জিনিষের দাম চড়ায়, চাকর-আয়া আমাদের কাছে এলে তাদের মূল্য বেড়ে যায়। দরজির দোকানে আমরা বেশি পয়সা দি, যেমন দি ফলের দোকানে, রুটির দোকানে। লোকে বোধহয় ভাবে, আমাদের পয়সা বেশি, বুদ্ধি কম। হয়তো ভাবে, ওরা আমাদের যুগ যুগ ধ'রে লুটে খেয়েছে, এবার, স্থযোগ পেলে, আমরাই বা কেন এক-আধটু জুলুম করবো না। তার মানে এই নয় যে ভারতবর্ষের সবাই এ ধরনের। আপনারা

অত্যন্ত ভদ্র, মার্জিত এবং দয়াবান। তবে, পৃথিবীর অন্য দেশগুলির চেয়ে এমন কিছু আলাদা নন। আপনারাও ভোগী, আপনাদেরও লোভ আছে, আপনারাও দরকার হ'লে মিথ্যে বা অর্ধসত্য বলেন। জাতীয় স্বার্থে আপনারা লড়াই করেন, ব্যক্তিস্বার্থে অন্যায় করেন। মানুষ সবদেশেই সমান দুর্বল, আবার সমান মহান।"

হাইন্‌রিক স্ম্যাট্‌জ্‌কে ভালো লাগল প্রধানত তার চরিত্রের সরল বলিষ্ঠতায়। অত বড় মানুষটার মধ্যে ছোট ছেলের সারল্য, আবার গম্ভীর দৃঢ়তা। বিশেষ আকর্ষণীয় তার কৌতুকবোধ। সব কিছুতেই সে কৌতুক খুঁজে পায়। রঙ্গ করতে ভালবাসে। এ কৌতুক ও রঙ্গে ব্যঙ্গের লেশমাত্র নেই। হাইন্‌রিক হাসতে পারে। শুধু পরকে নিয়ে নয়। নিজেকে নিয়েও।

হাইন্‌রিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব জমে উঠল। শহরে এলে আমার খোঁজ করত। টেনে নিয়ে যেত তার ফ্‌ল্যাটে। নয়তো গল্পে জমে যেতাম আমার বাসাতে। দিল্লীর জনাকীর্ণ এক পাড়ায় আমার দু-কামরা দরিদ্র নিবাস, হাইন্‌রিকের ফোর্ড গাড়ী বাড়ীর সামনে দাঁড়ালে, ভারী বেখাপ্পা দেখাত। কিন্তু হাইন্‌রিক বলত, আমার কাছে এসে সে তৃপ্তি পায়। "তুমি ভারতীয়ের বেশে, ভারতীয় পরিবেশে আমাকে গ্রহণ কর, ডাল-তরকারী-মাছের ঝোল খেতে দাও, আমার ভাল লাগে। তোমাদের দেশে যেটা সবচেয়ে দুঃসহ তা হচ্চে য়ুরোপের ম্লান অনুকরণ। পৃথিবীর আর কোনও দেশে এতোটা কিন্তু নেই।"

আমার ছা-পোষা গৃহিনী যে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরাজীতে ওর সঙ্গে আলাপ করেন তাতেও হাইন্‌রিক খুব খুশি! এসেই বলবে, "আজ কি খাবো? আপনার সেই আলু-পোস্ত আছে তো!"

আমাকে বলে, "বিঘোষিত-বগল, প্রচারিত-পেট, কর্তিত-কেশ, রক্তোষ্ঠ-ঠোঁট মেয়েদের চেয়ে তোমার এই সলজ্জ কমনীয় স্ত্রীকে আমার অনেক বেশি ভাল লাগে। আমরা স্বাধীন ভারতে আসি ভারতবর্ষকে

দেখবো বলে; য়ুরোপের একটা বটতলা সংস্করণ দেখবার লিপ্সা আমাদের নেই।"

জার্মান-চিত্ত ভাবপ্রবণ। য়ুরোপে বড় বড় ভাবধারা—মার্টিন লুথার থেকে কার্ল মার্ক্স—এসেছে জার্মেনী থেকে। হাইন্‌রিক স্ম্যট্‌জ্‌কে আমি জয় ক'রে নিলাম 'ক্ষুধিত পাষাণ' শুনিয়ে। প্রথম দিন যখন গল্পটা তার কাছে অনুবাদ ক'রে বলে গেলাম, সে বিহ্বল, আত্মহারা হল। অতীতের আহ্বান সদাই তার বুকে বাজছে; 'ক্ষুধিত পাষাণ' তার কাছে মূর্ত অতীত হয়ে উঠল। গল্প শেষ হ'লে একটা কথাও সে বলতে পারল না। পরের দিন এসে আবার শুনতে চাইল। আমি যখন পড়তে লাগলাম, "তুমি কবে ছিলে, কোথায় ছিলে, হে দিব্যরূপিনী। তুমি কোন শীতল উৎসের তীরে খর্জুরকুঞ্জের ছায়ায় কোন গৃহহীনা মরুবাসিনীর কোলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে? তোমাকে কোন বেদুইন দস্যু বনলতা হইতে পুষ্পকোরকের মতো, মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্ন করিয়া বিদ্যুৎগামী অশ্বের উপরে চড়াইয়া জ্বলন্ত বালুকারাশি পার হইয়া কোন রাজপুরীর দাসীহাটে বিক্রয়ের জন্য লইয়া গিয়াছিল। সেখানে কোন বাদশাহের ভৃত্য তোমার নববিকশিত সলজ্জকাতর যৌবন-শোভা নিরীক্ষণ করিয়া স্বর্ণমুদ্রা গণিয়া দিয়া, সমুদ্র পার হইয়া, তোমাকে সোনার শিবিকায় বসাইয়া, প্রভুগৃহের অন্তঃপুরে উপহার দিয়াছিল। সেখানে সে কী ইতিহাস?......" হাইন্‌রিক কেমন অস্থির হ'য়ে উঠল, অত বড় মুখখানা ব্যথায় মেঘাক্রান্ত আকাশের মত থমথম করতে লাগল। যখনই সে আসত, তাকে একবার গল্পটা প'ড়ে শোনাতে হত। বাংলায় পর্যন্ত সে চাইত শুনতে, এবং শুনে শুনে, কয়েকটা বাংলা শব্দ তার আয়ত্ত হ'য়ে গেল।

একদিন বলল: "জানো, আমি কবি বা লেখক নই, কিন্তু মাটি খুঁড়ে অতীতের অন্ধকার পথে চলতে চলতে আমারও বার বার মনে হয়, অতীত মৃত নয়, জীবন্ত। প্রত্যেকটা পাথর আমার সঙ্গে কথা বলে, আমাকে ডাকে। আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে

জীবন্ত পুরী, প্রাণময় পুরুষ-রমণী। দেখতে পাই মণিমুক্তাখচিত রাজদরবার, কানের কাছে শুনতে পাই কলগুঞ্জন। মনে হয় আমার চতুর্দিকে প্রাণময় সব দেহ ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের অনেক কথা কইবার আছে, বলছে না। মাঝে মাঝে শুনতে পাই সুমিষ্ট কলহাস্য, আবার অব্যক্ত বেদনার রুদ্ধ রোদন। পরমুহূর্তে আমাকেও যেন কোনও মেহের আলি চীৎকার ক'রে বলে হটো, স'রে যাও, সরে যাও, সব মিথ্যে, সব ঝুটা হ্যায়!"

আমাকে নীরব দেখে হাইন্‌রিক বলল, "তোমাদের টাগোর ঠিক বলেছেন। সব পাষাণই ক্ষুধার্ত। তৃষ্ণার্ত। সজীব মানুষ দেখলে সে ক্ষুধার, তৃষ্ণার দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে থাকে।"

সুজাতা বসুর বিছানায় হাইন্‌রিক স্যুটজ্‌ একটা রাত কাটিয়েছিল। পাষাণ অতীতের ক্ষুধার্ত পরিবেশে।

রোগা ছিপছিপে মেয়ে, গায়ে মাংসের একান্ত অভাব। অথচ মুখখানা আশ্চর্য ভরপুর ও বুদ্ধিতে উজ্জ্বল। ছোটখাট রোগা দেহ, একরাশি কালো চুল, সপ্রতিভ বুদ্ধি-প্রাখর্য, এই হল একবাক্যে, সুজাতা বসু। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সসম্মানে প্রত্নতত্ত্বে এম, এ, পাশ করেছে; হাইন্‌রিক স্যুটজ্‌-এর অতীত-উদ্ধারী দলে ভর্তি হয়েছে। তার সঙ্গে গেছে বিহার, মাদ্রাজ। হাসিখুশি মেয়ে, কথা-বার্তায় ভারী চৌকস, কাজে মন আছে, সুন্দর গান করে। দলের মধ্যে সহজে চোখে পড়ে। হাইন্‌রিকেরও পড়লো।

সে চোখ সন্তুষ্ট শিক্ষকের। হাইন্‌রিক পাহাড়, সুজাতা বিশীর্ণা নদী। হাইন্‌রিক শিক্ষক, সুজাতা ছাত্রী। হাইন্‌রিক পঁয়তাল্লিশ, সুজাতা একুশ। হাইন্‌রিক স্বামী ও পিতা, সুজাতা কুমারী। হাইন্‌রিক জার্মান। সুজাতা বাঙ্গালী।

তবু সেতু আছে। হাইন্‌রিকের মতো সুজাতাও প্রত্নতত্ত্বে পাগল। তাকেও অতীত ডাকে, কথা বলে। পাষাণের ক্ষুধা তারও

প্রাণে বাজে। প্রত্নতত্ত্বে পাগল, তাই সুজাতা হাইন্‌রিকের ভক্ত। তার অসাধারণ জ্ঞান এবং অতিশয় বিনয়ে সুজাতা মুগ্ধ। হারানো ইতিহাসকে মাটির গর্ভ হ'তে টেনে বার করার যে-নেশা হাইন্‌রিককে পাগল করেছে, সে-নেশাকে সুজাতা শ্রদ্ধা করে। স্বাধীন ভারতে জ্ঞানের নেশায় ভয়ানক ঘাটতি; অধ্যাপকরা হয় নোট লেখেন, নয় সরকারী দাক্ষিণ্য লাভের উমেদারী করেন; তাই এই বিদেশী অনুসন্ধানীকে সুজাতার ভালো লাগে আরও বেশি। মাটির তলায় সুপ্ত পাথর পেলে হাইন্‌রিক পৃথিবী ভুলে যায়; তার সে সব-ভোলা-ভাব সুজাতার অন্তর স্পর্শ করে।

হাইন্‌রিক আমাকে পরিচয়ের দিন বলেছিল, "বিদেশী আমরা, ঠকবার জন্যে তৈরী হয়েই থাকি।"

ভারতবর্ষ থেকে বিদায় নেবার দিনও বলে গিয়েছিল, "আর কিছু না, সুজাতার কথা ভাবলে মনে হয় একটু যেন ঠকে গেলাম।"

"আমাদের কবি বলেছেন, জীবনের ধন কিছুই যায় না ফেলা।"

"কিন্তু দারিদ্র্য ?"

"আরও বলেছেন, ধুলোয় অবহেলিত হয়েও তারা পূর্ণের স্পর্শ বহন করে।"

"তোমরা হচ্চ অসংশোধনীয় রোমান্টিক", হাইন্‌রিক একগাল হেসেছিল।

মাদ্রাজ সহর থেকে কিছু দূরে একটা অতি পুরাতন সভ্যতার দ্রব্যসম্ভার খুঁড়তে নিযুক্ত ছিল হাইন্‌রিক ও তার দল। সুজাতা দলের অন্যতমা।

দ্রাবিড় সভ্যতার এ নিদর্শনগুলো উদ্ধার হ'লে মহেনজোদারোর চেয়েও প্রাচীন আর একটা সভ্যতার সন্ধান পাওয়া যাবে। হাইন্‌রিক মেতে আছে সন্ধান-নেশায়। মেতেছে সবাই। সুজাতাও। অনুসন্ধান

ইতিমধ্যে আশাতীত পুরস্কৃত হয়েছে, তাই উত্তেজনা সবার মধ্যে সমান সংক্রামিত। হাইন্‌রিক আহার নিদ্রা ত্যাগ করে দিনরাত মূক পাষাণের কথা ফোটাবার সাধনা করছে। মাটির নীচে পাওয়া গেছে বড় সহরের ভগ্নাবশেষ, একটি প্রাচীন রাজপুরীর আভাস। পাওয়া গেছে কয়েকটি অতি রমনীয় নারীমূর্তি। তাদের একটি নিয়ে হাইন্‌রিক ধ্যানমগ্ন। তার ধারণা এ কোনও রাজকুমারী। অনেক সাধনায়ও তার মুখে কথা ফোটাতে পারছে না। তাকিয়ে আছে তন্ময় হ'য়ে পাষাণ রাজকন্যার পানে। অপূর্ব সুষমায় ভরা মুখখানা। তন্বী দেহ সুনিপুণ হাতে গড়া। হাইন্‌রিক বার বার হাত বোলাচ্ছে তার গালে, কপালে, কৃষ্ণ পয়োধরে, ক্ষীণ কটিদেশে, সুগঠিত জঙঘায়। বলছে, কথা কও, কথা কও। তুমি কে? কী তোমর ইতিহাস? আমাকে বল, আমি যে শোনার অপেক্ষায় বসে আছি!

রাত অনেক? হাইন্‌রিক ব'সে আছে তার তাঁবুতে পাথরের রাজকন্যা নিয়ে। পাশের তাঁবুতে ছেলেমেয়েরা কাজ করছে। কাজের সঙ্গে চলছে হাসি-গল্প, তার রেশ ভেসে আসছে হাইন্‌রিকের তাঁবুতে। হঠাৎ সে শুনতে পেল মধুর কণ্ঠের সঙ্গীত। চলে এল অতীত থেকে বর্তমানে। রাজকন্যাকে সযত্নে সরিয়ে রেখে ক্লান্ত দেহ টেনে নিয়ে গেল পাশের তাঁবুতে।

গাইছিল সুজাতা। হাইন্‌রিককে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করল, কিছু পেলেন? হাইন্‌রিক মাথা নেড়ে বলল, না। তারপর হেসে ফেলল। করুণ সে হাসি। বলল, "কিছুতেই কথা বলছে না রাজকন্যা। তবে, বলবে। আজ না হয় কাল।"

"আপনি কিছু খেয়ে নিন", সুজাতা বলল।

হাইন্‌রিক রাজী হল। "আজ আর কাজ নয়। খাবো, তোমাদের গল্প আর গান শুনবো।"

"রাজকন্যার নেশা কেটেছে?" প্রশ্ন করল সুজাতা

"এবার কাটবে", হেসে জাবাব দিল হাইন্‌রিক।

খেলা ওদের সামনে বসে। পান করল পুরো আধবোতল হুইস্কি। তারপর বলল, এবার গান হোক।

গান জানে সুজাতা। কিন্তু সুজাতা সহজে রাজী হল না। সর্ত করল, হাইন্‌রিককেও গাইতে হবে। "বেশ, বেশ, আমিও গাইব," রাজী হল হাইন্‌রিক। "এই খোলা মাঠে কোনও সভ্যতা তাতে বিনষ্ট হবে না।"

"বরং একটা লুপ্ত সভ্যতা জেগে উঠতে পারে," চটুল জবাব করল সুজাতা।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত চলল গল্প, গান। গাইল সুজাতা, গাইল ছেলেমেয়েরা সবাই একসঙ্গে, আর মোটা কর্কশ গলায় গান ধরল হাইন্‌রিক। প্রেমের গান। গাইতে গাইতে বড় একা নিঃসঙ্গ মনে হল নিজেকে। পাষাণ রাজকন্যার সঙ্গে দিনের পর দিন কাটিয়ে যে-উত্তাপ লাগে নি গায়ে, তার জন্যে মন ক্ষুধার্ত হল। অত বড় দেহটার মধ্যে শিরশির বয়ে গেল ব্যথার স্রোত। হাইন্‌রিকের চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল।

এক সময় আসর ভাঙ্গল। যে যার তঁবুতে গেল ঘুমুতে। ছেলেদের জন্য দুটো তাঁবু, এক-একটায় দুজন। সুজতার জন্যে একটি। হাইন্‌রিকের জন্য আর একটি।

তাঁবুতে ফিরে সুজাতা হাত-মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে সামান্য প্রসাধন করল। লণ্ঠনটা স্তিমিত করে শুতে যাবে, এমন সময় পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকল হাইন্‌রিক। অবাক হল সুজাতা। হাইন্‌রিকের পরণে স্লিপিং স্যুট, হাতে জ্বলন্ত সিগারেট। মুখে জমাট গাম্ভীর্য।

"আপনি? কিছু কাজ আছে?"

"আছে। আসতে পারি?"

"নিশ্চয়। আসুন।"

হাইন্‌রিক এল, এবং এসে সুজাতাকে জড়িয়ে ধরল।

প্রথমটা ভয়ানক বিস্মিত হল সুজাতা। বিরাট দেহে সে যেন হারিয়ে গেল। তাকিয়ে দেখল হাইন্‌রিকের চোখে জমাট নীল বরফ! কঠিন দুটো প্রকাণ্ড বাহু তাকে পিষে ফেলছে বিরাট বুকে। সুজাতা ভয় পেল।

"কী করছেন আপনি।"

হাইন্‌রিক উত্তর দিল না। শুধু তার মুখ লেলিহান অগ্নিশিখার মতো সুজাতার সর্বশরীর আস্বাদ করতে লাগলো।

এক ফাঁকে টুপ ক'রে সুজাতা হাইন্‌রিকের বন্ধন কেটে বেরিয়ে এল। স'রে গেল তাঁবুর দরজায়। বলল, "এ কী বিশ্রী ব্যাপার? আমি চেঁচামেচি করলে আপনার মান থাকবে? এ সবের অর্থ কি?"

এবার হাইন্‌রিকের মুখে ভাষা এল। সে বলল, "একা থাকতে পারছি না, সুজাতা। একা ঘরে হাজার হাজার পাষাণ রাজকন্যা আমার চতুর্দিকে নেচে বেড়াচ্ছে। নিরাবরণ তাদের দেহে পুরুষের কামনা ফল ধরেছে। অথচ কেউ আমার কছে ধরা দিচ্ছে না।"

"তাই এসেছেন জীবন্ত নারীর খোঁজে?" সুজাতার কণ্ঠে তীব্র ধার।

সে ধার হাইন্‌রিককে কাটল না। "তোমার কাছে আমায় থাকতে দেবে, সুজাতা?" অসহায় বালকের মত সে যেন কেঁদে উঠল। "আমার একটু ঘুম চাই। না ঘুমুলে আমি পাগল হয়ে যাবো।"

চুপ ক'রে সুজাতা কিছুক্ষণ ভাবল। তারপর বলল, "আপনি আমার বিছানায় শুয়ে পড়ুন। আমি চেয়ারে বসে থাকবো।"

"না, না, না"—চীৎকার করে উঠল হাইন্‌রিক। "তাতে আমার ঘুম আসবে না। আমি তোমাকে জড়িয়ে শোব। তোমার দেহ আমায় ঘুম পাড়াবে।"

"তার মানে?"

"তার মানে, আমি ঘুমুতে চাই। নারীদেহের স্পর্শ না পেলে আমার ঘুম আসবে না।"

আবার চুপ ক'রে রইল সুজাতা। কিছুক্ষণ পরে বলল, "শুধু স্পর্শ ?"

"অন্ততঃ শুধু স্পর্শ।"

সুজাতা এগিয়ে এল। আস্তে শুয়ে পড়লো বিছানায়। হাইন্‌রিককে বললে, "আসুন। শুয়ে পড়ুন। দেখবেন, নিজের মান রাখবেন।"

সে বিচিত্র রজনীর অভিজ্ঞতা হাইন্‌রিক আমাকে বলেছিল।

"আমি নেশাগ্রস্তের মত সুজাতার পাশে শুয়ে পড়লাম। জড়িয়ে ধরলাম তাকে। সে ছেড়ে দিল নিজেকে আমার বাহুবন্ধনে। ছেড়ে দিল, কিন্তু তবু নিজেকে ধ'রে রাখল শক্ত করে। হাত বুলালো আমার কপালে, গালে, মাথায়। তার ছোট্ট দেহটি ঝর্ণার মত ব'য়ে গেল আমার বিরাট পাহাড়-দেহের গায়ে গায়ে। তাকে বার বার আমি চুমু খেলাম। আমার লুব্ধ হাত দেহে বিচরণ করল। বাধা দিল না সুজাতা। শুধু মাঝে মাঝে বলল, এবার ঘুমান। আমি ক্ষেপে উঠলাম, কিন্তু সে আমায় নিরস্ত করল। আমি তার কাছে ভিক্ষা চাইলাম, সে টলল না; আমি জোর করতে গিয়ে দেখলাম আমার চাইতে তার জোর বেশি। কুমারী সুজাতা কিছুতেই আমার দেহের আগুনে জ্বলল না। চেষ্টা করল আমার আগুন নিবুতে। এবং কী আশ্চর্য, এক সময় সে আমাকে শীতল ক'রে আনল। ক্লান্ত আলিঙ্গন থেকে তাকে মুক্তি দিয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। প্রভাত হবার আগে সে আমায় জাগাল। তাকিয়ে দেখি, বসে আছে সুজাতা চেয়ারে, সারারাত ঘুমোয় নি। মৃদু হেসে বললে, 'এবার আপনার তাঁবুতে যান।'

"আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম সুজাতার দিকে। সে বলল, 'ভালো ঘুমিয়েছেন তো?' কথা এলো না মুখে, শুধু তাকে ধন্যবাদ দিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম। দেহমন ঝরঝরে হাল্কা হয়ে গেছে সুতৃপ্ত সুপ্তিতে। তাঁবুতে এসে কাজে লেগে গেলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার সাধনা সফল হল। রাজকন্যার রহস্য ভেদ করার উত্তেজনায় ছুটে বেরিয়ে প্রথম গেলাম সুজাতার তাঁবুতে। দেখি, সে পরম নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে আছে বিছানায়।"

"সুজাতার মত মেয়ে কেবল ভারতবর্ষেই বুঝি সম্ভব", বলেছিল হাইন্‌রিক স্যুট্‌জ্‌। "এ ঘটনার পরও ছু' সপ্তাহ আমরা ওখানে ছিলাম। সুজাতা সেই যেমন আগে ছিল তেমনি রয়ে গেল। কোনও পরিবর্তন দেখলাম না তার ব্যবহারে, কথা-বার্তায়। আমার সঙ্গে একা বসে অনেক কাজ করল। ঘুণাক্ষরে বুঝতে দিল না সে কি ভেবেছে, কি ভাবছে। আগে যেমন চলত, তেমনি চলল আমাদের শিক্ষক-ছাত্রী সম্পর্ক। আমায় একটা সুযোগও দিল না মাপ চাইতে। তার ছোট শীর্ণ দেহের, ঢলঢলে বুদ্ধিদীপ্ত মুখের পানে তাকিয়ে মনে হল, সে রাত্রির ঘটনাটা যেন সত্যি নয়, আমার স্বপ্ন, আমার মায়া।

"দিল্লী ফিরে আসতে আমাদের কাজ শেষ হল। সুজাতার এবার ছুটি। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সবচেয়ে মূল্যবান কাজ সে করেছে। তাকে আমি বড় একটা সার্টিফিকেট দিলাম। বিদায় নিতে এল সুজাতা আমার আপিসে। তার কাজের প্রশংসা করলাম। বিনীত কৃতজ্ঞ হাস্যে সে তা গ্রহন করল।

"তুমি এবার ছুটি নিচ্ছ?"—প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ। একটা কাজ পেয়েছি য়ুনিভার্সিটিতে।"

"খুব ভাল। অধ্যাপক দাতার তোমার কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।"

"জানি। শুধু আপনাকেই রেফারেন্স হিসাবে উল্লেখ করেছিলাম। আপনি আমার উচ্চ প্রশংসা করেছেন। আপনার সুপারিশে কাজটা আমার হল। এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। আমার ধন্যবাদ জানবেন।"

"আমিও তোমার কাছে খুব কৃতজ্ঞ, সুজাতা।"

"কেন?"

"তুমি আমার সম্মান রেখেছ।"

"ও, তাই।"

"কথা বাড়াল না সুজাতা। যাবার সময় হল তার। আমার হঠাৎ ইচ্ছে হল চেপে ধরি ওকে। হাত বাড়ালাম বিদায়-করমর্দনের। সুজাতা আনত হ'য়ে ভারতীয় কায়দায় আমার পা ছুঁয়ে প্রণাম করল।"

"সুজাতা চ'লে গেল। আমি হতবুদ্ধি হ'য়ে ভাবলাম, আশ্চর্য এই মেয়েটি! কিন্তু মনের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, হাইন্‌রিক তুমি ঠকেছ।"

আমি বললাম, "তার নাম পুরুষ।"

রাগ নেই

একদিন, সে অনেকদিন আগে, যেন অন্য কোন যুগে, বড় রাগ ছিল পৃথিরাজ কোশলের। তবু দশজন তাকে বলত ঠাণ্ডা-মাথা, স্থির-বুদ্ধি, বিচক্ষণ। সহজে কেউ মেজাজ দেখতে পেত না। কিন্তু একবার রাগলে সে কুরুক্ষেত্র বাধাত; বিপদ-আপদের কথা একেবারে মনে আনত না; ফলাফলের পরোয়া করত না।

হাসি-খুসি, বুদ্ধি-দীপ্ত মানুষটার ঠাণ্ডা মেজাজ গরম হত একমাত্র একটা কারণে। অন্যায় সে সইতে পারত না। কী জানি কোথা থেকে, কোন অবাস্তব, অসম্ভব, অজ্ঞাত সঞ্চয় থেকে, আশ্চর্য বিশ্বাস সে সংগ্রহ করেছিল: মানুষ ন্যায় করবে, ন্যায় পথে চলবে। ছোটবেলা থেকে সে মিথ্যা বলত না, স্পষ্ট সহজ সত্যভাষণে সবাইকে অবাক করত। লুকিয়ে কোন কাজ করায় বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না পৃথিরাজ কোশলের। চরিত্র ছিল তার বর্শার মত সোজা, তীক্ষ্ণ; বর্শা-ফলকের মত চকচকে। বাপ গঙ্গাধর কোশল কোন সদাগরের গদিতে খাতা লিখত; অপ্রচুর জমিজমা যা ছিল তাতে সংসারে প্রাচুর্য না হ'লেও অভাব বোধ হত না, পৃথিরাজ গ্রামের স্কুল পেরিয়ে সহরের কলেজে ভর্তি হতে পারল, যদিও তার বাপের বুকে সদাই দুরু দুরু ভয়, ছেলে কখন সাধু-সন্ত হ'য়ে সংসার ত্যাগ করে।

পৃথিরাজ সন্ন্যেসী হল না। স্বদেশী হল।

পঞ্জাবে সে সময় লালা লাজপৎ রায়ের যুগ বহুদিন উত্তীর্ণ। গান্ধীজী একদিন অসহযোগের বন্যা এনেছিলেন, পঞ্জাব বাংলা-মহারাষ্ট্রের মত ভেসে যায় নি, কিন্তু প্লাবন তার অঙ্গনেও ঢুকেছিল। সে বন্যা শেষ হ'য়ে এখন জটিল রাজনীতির পলিমাটিতে দলীয় চাষ আবাদ চলছে। পৃথিরাজ যে কলেজে পড়ে তার অন্যতম অধ্যাপক

গান্ধীজীর শিষ্য। মুলতানের লোক, নাম সুরেন্দ্র মেহতা, লোকের কাছে পরিচিত সুরেন্দর-ভাই। নিজের হাতে সুতো কেটে মোটা কাপড় তৈরী করে তিনি বস্ত্রের প্রয়োজন মেটান; উপার্জিত অর্থের অংশ পাঠিয়ে দেন গান্ধীজীর কাছে। এসব খবর সবাই জানে; জানান সযত্নে তিনিই। পড়াতে পড়াতে দেশের কথা বলেন ছাত্রদের, বলেন গান্ধীজীর কথা, বলতে বলতে চোখে জল ভরে আসে। ছাত্ররা মুগ্ধ হয়ে তাঁর কথা শোনে। কারুর বুকে ব্যথা লাগে, চোখ জ্বালা করে।

পৃথ্বিরাজ কোশল সুরেন্দর-ভাই-এর মন্ত্রশিষ্য হল। সে যেভাবে গড়ে উঠেছিল একটা বিরাট ভাবপ্রবণ আদর্শের আশ্রয় ছাড়া তার জীবন অচল হত। আশ্রয় সে পেল সুরেন্দর-ভাই-এর পৌরহিত্যে ভারতবর্ষ নামক এক রহস্যময় ভাবাবেগের পক্ষপুটে। আশ্রয় পেয়ে সে আরও প্রদীপ্ত হল।

পঞ্জাবে নিবাস হলেও গঙ্গাধর কোশল পঞ্জাবী নয়; আদি বাসস্থান তাদের উত্তর প্রদেশের পাহাড়ী অঞ্চলে। দুই পুরুষ পঞ্জাবে বাস করে অবশ্য তারা পঞ্জাবীই হয়ে গেছে। তথাপি পৃথ্বিরাজের স্বদেশী হবার পেছনে তার বাপের বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না। কিন্তু, কি জানি হয়তো, মৃত ঠাকুরদাদার কিছু ছিল। জমিদারী জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অপরাধে একবার পিতামহের কয়েদ হয়েছিল, জেল থেকে ফিরে গ্রাম ত্যাগ করে চলে এসেছিল পঞ্জাবে, জমি কিনে নতুন ঘর তুলে, নতুন আবাদ করে, নতুন ভাবে বাঁচবার চেষ্টা করতে করতে একদিন মরে গিয়েছিল। তেজী বাপের সন্তান গঙ্গাধর অত্যন্ত নিরীহ শান্ত মানুষ, বিদ্রোহের অপর প্রান্তে তার জীবন শান্তির নীড়। সামান্য যা লেখাপড়া শিখেছে তার নিপুণ বিনিয়োগে যেটুকু জীবিকা আসতো তাতেই সে পরিতৃপ্ত। কিন্তু তেজী হয়ে বেড়ে উঠল তার সন্তান পৃথ্বিরাজ, নামটাও যার, হঠাৎ কী রকম রাজসিক। বাপ বলত, ওর মধ্যে ওর ঠাকুর্দার তেজ এসেছে ফিরে। বলতে বলতে দীর্ঘশ্বাস

ফেলত, তাকাত স্বর্গগতা পত্নীর অনেকখানি মুছে যাওয়া ছবির দিকে, আর ভাবত, ঐ গ্রাম্যরমণী তার মত এমন শান্ত নিরীহ মানুষের বীজানু নিয়ে এমন তেজীয়ান একটা মরদ পয়দা করল কী করে।

"তোমার মা নেই?" একদিন চরকায় সুতা কাটতে কাটতে জিজ্ঞেস করেছিলেন সুরেন্দর-ভাই।

"না।" সংক্ষেপে উত্তর দিয়েছিল পৃথিরাজ।

"কবে মারা গেছেন?" সহানুভূতির সুরে প্রশ্ন করেছিলেন সুরেন্দর-ভাই।

"অনেকদিন আগে।" সরু সুতার দিকে তাকিয়ে জবাব দিয়েছিল পৃথিরাজ।

"আমিও খুব ছোটোবেলায় মা হারিয়েছি", কেমন যেন হঠাৎ ভারী গলায় বলেছিলেন সুরেন্দর-ভাই। "মা না থাকার দুঃখ যে কী আমি জানি।"

নিঃশব্দে চরকায় তুলো পরিয়েছিল পৃথিরাজ।

"কিন্তু একদিন সে দুঃখ আমার মিটে গেল। মা আমি পেলাম।" তৃপ্ত কণ্ঠে বলেছিলেন সুরেন্দর-ভাই।

মুহূর্তের জন্য চরকা বন্ধ করে তাকিয়েছিল পৃথিরাজ।

"একদিন মা পেলাম", আবার বলেছিলেন সুরেন্দর-ভাই। "মায়ের নাম ভারতবর্ষ। জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ। ভারতবর্ষ আমাদের সবাকার মা। এদেশে আমরা কেউ মাতৃহীন নই। মা পেয়ে মন ভ'রে গেল। তুমিও ভারতবর্ষকে মা ব'লে স্বীকার করো। তোমারও অন্তর ভরে যাবে।"

পৃথিরাজের বুকটা টনটন ক'রে উঠল। গলায় 'মা' ধ্বনি এসে আটকে গেল।

"তোমার একটি সুন্দরী বোন আছে শুনেছি", পরম স্নেহভরে প্রশ্ন করলেন সুরেন্দর-ভাই।
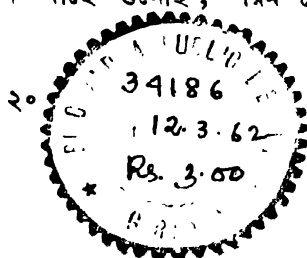
"আজ্ঞে হ্যাঁ", আবেগ চেপে জবাব দিল পৃথ্বিরাজ।

"তাকেও নিয়ে এসো আমার কাছে। তোমার মত তাকেও দীক্ষা দেব দেশসেবার। মেয়েরা যতদিন দেশের কাজে না নামবে, ততদিন বন্দিনী ভারত মায়ের মুক্তি নেই।"

"সে এখনো ছোট", বলল পৃথ্বিরাজ। "বাবাকে দেখাশোনা করে। বাবার চোখের মণি।"

উদাস নয়ন তুলে একবার তাকালেন সুরেন্দর-ভাই। ডেকে উঠলেন, মা! মা!

সারা দেহ শিউরে উঠল পৃথ্বিরাজ কোশলের।

দেশকে জননী, ধাত্রীরূপে জেনে পৃথ্বিরাজের মায়ের জন্য কেমন একটা টনটনে দরদ জন্মাল। জীবনটা হঠাৎ বড় ভারী মনে হল যখন বুঝতে পারল মায়ের পদে পদে অপমান। মায়ের প্রতি অন্যায় দেখে রাগ হতে লাগল। তারপর একদিন সে ভয়ানক রেগেই গেল।

কলেজের বাৎসরিক অধিবেশনে প্রধান অতিথি হ'য়ে এসেছিলেন ইংরেজ কমিশনার হোয়াইটহেড্ সাহেব। বক্তৃতায় তিনি গান্ধীজীর তীব্র নিন্দা করলেন, তীক্ষ্ণস্বরে স্মরণ করিয়ে দিলেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন ভারতবর্ষকে ইংরেজ কেমন করে, কত পরিশ্রমে, আলোয় নিয়ে আসছে, সে কাজ কত দুঃসাধ্য, এখনও কত অসমাপ্ত। বললেন, দেশকে তোমরা ভালোবাসো, সে তো ভাল কথা; আমরাও আমাদের দেশকে ভালবাসি। কিন্তু ভালবাসার নামে বাস্তবকে উপেক্ষা কোরো না। ভারতবর্ষ যে এখনও পৃথিবীর অগ্রসর দেশগুলির কত পেছনে তা ভুলে যেয়ো না। ভারতবর্ষের জন্য আমাদের দরদ তোমাদের চেয়ে কম নয়। আমরা তার প্রকৃত চেহারাটা তোমাদের চেয়ে বেশি জানি। অপ্রিয় হলেও একথা কঠিন সত্য, স্বাধীনতার যোগ্য হতে ভারতবর্ষের এখনও অনেক দেরী।"

একদল ছেলের মাঝখানে বসে পৃথ্বিরাজ ইংরেজ রাজপুরুষের

বক্তৃতা শুনছিল। শুনতে শুনতে কেমন একটা অন্তর্জ্বালা আরম্ভ হল। প্রথম জ্বলে উঠল মাথা, সে দহন ছড়িয়ে পড়ল সমস্ত দেহে। বুকে ব্যথা জমে উঠল। দেখতে পেল তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে —তার মা। ব্যথায় কাতর, অপমানে আহত। জননী ভারতবর্ষ তাকাচ্ছে সভার সবগুলি মানুষের পানে, বলছে: প্রতিবাদ করো, আমার এ অপমান সহ্য কোরো না। পৃথ্বিরাজ চোখে অন্ধকার দেখল। সে অন্ধকার আরো প্রগাঢ় হল যখন সুরেন্দর-ভাই, সে দেখতে পেল, মাথা নীচু করে এক কোণে বক্তৃতা শুনছেন, মুখে তাঁর রাগের চিহ্ন মাত্র নেই।

কে যেন চাবুক মেরে পৃথ্বিরাজকে দাঁড় করাল। কে যেন চাবুক মেরে তার মুখ থেকে প্রতিবাদ টেনে বার করল। সে বলে উঠল, "আপনি যা বলছেন সব মিথ্যে। আমি তার প্রতিবাদ করি।"

সভা নিস্তব্ধ, মানুষগুলি বিস্ময়ে, ভয়ে বোবা। অতগুলি বুকের নিঃশ্বাস একত্র হয়ে কেমন একটা ঝড় উঠল। নীল চোখ রক্তবর্ণ করে হোয়াইটহেড্ সাহেব তাকালেন। প্রিন্সিপাল দৌড়ে এসে পৃথ্বিরাজকে টেনে বার করে নিতে চাইলেন।

পৃথ্বিরাজ পাহাড়ের মত নিশ্চল হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। দু'হাত তুলে চেঁচিয়ে উঠল, "বন্দেমাতরম্"। কোনও প্রতিধ্বনি হল না। সুরেন্দর-ভাই রাজপুরুষের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করলেন। চারজন অধ্যাপক এসে পৃথ্বিরাজকে টেনে বাহিরে নিয়ে গেলেন।

পৃথ্বিরাজ কোশলের ছাত্রজীবন শেষ হল। প্রিন্সিপাল তাকে তাড়ালেন। তারপর শীঘ্রই একদিন রাজার বন্দীশালায় সে নিমন্ত্রণ পেল।

জেলে যেতে পৃথ্বিরাজের মন্দ লাগল না। বেশ একটু গর্ব হল, তৃপ্তি হল। শুধু একটা প্রশ্ন মনের মধ্যে পাক খেতে থাকল: সুরেন্দর-ভাই এ অন্যায় সহ্য করলেন কী ক'রে? কেন তিনি প্রতিবাদ করলেন না? কেন তাঁর রাগ হল না? কিসের জন্য তিনি মার্জনা চাইলেন?

মানুষের জীবন আকস্মিক ঘটনায় তৈরী। ' পৃথিরাজ কোশলের জীবন আকস্মিক কারাবাসে বদলে গেল। আর, বদলে গেল তার কারাবাসের অবসরে সমস্ত পৃথিবীটা, তাকে একেবারে উপেক্ষা করে।

জেল থেকে বেড়িয়ে পৃথিরাজ দেখল বাবা বুড়ো হয়েছে, সীতা বেড়ে উঠেছে। সীতা তার সেই সুন্দরী বোন, যার জন্ম দিতে গিয়ে তার প্রকৃত জননীর অকালে মৃত্যু হয়েছিল, যে তাব বাবার চোখের মণি, যাকেও, যাকে পর্যন্ত, সুরেন্দর-ভাই স্বদেশী করতে চেয়েছিলেন। বাড়ীতে পাশাপাশি জীবনের বিকাশ ও অবক্ষয় বড় রহস্যময় মনে হল পৃথিরাজের। বুঝল, বাপের বয়স অসম্ভব বেড়ে গেছে কারাগমনে; কিশোরী সীতা সে দুর্ঘটনাকে উপেক্ষা করে যৌবনের পথে পা বাড়িয়েছে। কর্তব্যবোধে বাপের পাশে দাঁড়াবার সদিচ্ছা নিয়ে পৃথিরাজ চাকরীর চেষ্টা করল, না পেয়ে একদিন আবার শরণাপন্ন হল সুরেন্দর-ভাই-এর। দলীয় রাজনীতিতে তখন তাঁর আসন পাকাপোক্ত। তিনি আবার সুন্দর সুন্দর বুক-কাঁপানো কথা বললেন, দেশের কথা কইতে আবার তাঁর চোখে জল এল। আবার বললেন, তোমাব বোনকে নিয়ে এসো, সেও দেশের কাজ করুক। পৃথিরাজ যখন বলল, একদিন নিয়ে আসবে, সুরেন্দর-ভাই-ই তাকে চলনসই একটা চাকরী পাইয়ে দিলেন।

চাষীদের সমবায় সমিতি সমস্ত পাঞ্জাব জু'ড়ে গ'ড়ে উঠছে। এমনি একটা সমিতির বেতনভুক সম্পাদক নিযুক্ত হল পৃথিরাজ কোশল।

বুড়ো গঙ্গাধর কোশল কিন্তু বিশেষ ভরসা পেল না। মাঝে মাঝে স্বল্পভাষী সে ছেলের মুখের দিকে অবাক বিস্ময়ে তাকায়, যেন ওকে ঠিক চিনতে পারে না। সীতাকে সুরেন্দর-ভাই-এর কাছে পাঠাতে সে কিছুতেই রাজী হল না। সীতার বিয়ের জন্যে তৎপর হবার সঙ্গে সঙ্গে গঙ্গাধর কোশল একদিন হাঠাৎ ম'রে গেল। পৃথিরাজ কী ভেবে সীতাকে স্বদেশের পথে না নিয়ে, রেখে এল মামাবাড়ী ফিরোজপুরে। সুরেন্দর-ভাই দুঃখিত হলেন ভারত মাতার সেবায় একজন

স্বেচ্ছাসেবিকার অভাবে। দীর্ঘশ্বাস চেপে উদাস চোখে শূন্যের পানে তাকিয়ে রইলেন। এমন সময় ঘটল পৃথ্বিরাজের জীবনে দ্বিতীয় আকস্মিক ঘটনা।

চাষীরা চিরদিন ঋণের জন্যে হাত পেতে এসেছে মহাজনের কাছে। বছর বছর সুদ গুণেছে, সুদের সঙ্গে সুদ যোগ দিলে আসলের বিশগুণ, অথচ আসল আর শোধ হয় নি। গুজব উঠল পাঞ্জাব সরকার চাষীদের ঋণের বোঝা লাঘব করবার জন্যে আইন তৈরী করবেন। অমনি ঋণ আদায়ের জন্যে মহাজন মহলে তৎপরতা ভয়ানক বেড়ে গেল। জুলুম শুরু হল চাষীদের ওপর। গড়-হরিদাস গ্রামে একদল চাষী মহাজনের বাড়ী চড়াও হ'য়ে খৎ ফেরত চাইল। ভয় পেয়ে মহাজন বন্দুক দাগল, জখম হল দু'জন চাষী। তাঁরা ক্ষেপে গিয়ে আক্রমণ করল মহাজনের বাড়ী। মহাজনের প্রাণ গেল। বাড়ী লুট হল। চাষীদের দল হল ভারী। উত্তেজিত হ'য়ে তারা আরও দুই মহাজনের বাড়ী চড়াও করল। ছোটখাট একটা শ্রেণী-যুদ্ধ হ'য়ে গেল দু-তিনখানা গ্রামে।

দুদিন পরে কংগ্রেসী ও মুসলিম লীগ সংবাদপত্রে একসঙ্গে খবর ছাপা হ'ল, সাম্প্রদায়িক সংঘাত ঘটে গেছে তিনখানা গ্রামে। কংগ্রেসী কাগজে লেখা হল মুসলমান চাষীরা হিন্দু মহাজনদের আক্রমণ করেছে, একজনের প্রাণ নিয়েছে। মুসলিম লীগের কাগজ লিখল, হিন্দু মহাজন দরিদ্র মুসলমান খাতকের ওপর সুদের জুলুমের সঙ্গে বন্দুকের গুলি যোগ করেছে। একপক্ষ বলল, ইসলাম বিপন্ন; অন্য পক্ষ জবাব দিল, হিন্দু ধর্মের সর্বনাশ।

পৃথ্বিরাজ গিয়ে হাজির হল সুরেন্দর-ভাই-এর বাড়ী। দেখতে পেল স্থানীয় কংগ্রেসী নেতারা সেখানে উপস্থিত। তার মধ্যে আছে লালা গোপালদাস, ঘি-এর ব্যবসায় লাখপতি; চৌধুরী ডেপুটিমল, বড় জমিদার।

সুরেন্দর-ভাই তাকে দু-চারটা নির্বিকার কুশল প্রশ্ন করলেন।

"একটা নিবেদন আছে, মাষ্টার সাব", বিনীত কণ্ঠে পৃথিরাজ বলল।

"বলো।"

"গড়-হরিদাস ও পাশের গ্রামের ব্যাপারটা—"

"কেন? আরও কিছু ঘটেছে না কি?"

"আজ্ঞে না। আমাদের কাগজে ওটা হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা বলে লেখা হয়েছে।"

"ঠিকই তো!"

"আজ্ঞে, তা তো নয়। খাতকদের মধ্যে হিন্দুও ছিল, মুসলমানও ছিল। আবার মহাজনদের মধ্যে দুজন হিন্দু, একজন মুসলমান। ব্যাপারটা তাহলে সাম্প্রদায়িক হ'ল কি ক'রে?"

সুরেন্দর-ভাই ও অন্য কংগ্রেসী নেতারা বিস্ময়ে হতবাক হলেন।

"এমন কথা তোমায় কে বললে?"

"আমি নিজেই বলছি। আমি জানি একথা সত্যি।"

"যা ঘটে সব সত্যি নয়।" গম্ভীর গলায় সুরেন্দর-ভাই বললেন।

"সে কী কথা মাষ্টার সাব! যা ঘটেছে তাই তো এক্ষেত্রে সত্যি। যা হয়নি তাই আমরা প্রচার করছি।"

"এজন্যেই তোমার লেখাপড়া হ'ল না, পৃথিরাজ! রাজনীতির সত্য আলাদা জিনিষ। যা ঘটে তাই সব নয়, ঘটনাকে তৈরী করতে হয়, ঘটনার মোড় ফিরিয়ে দিতে হয়!"

অবাক বিস্ময়ে ব'সে ব'সে পৃথিরাজ শুনল :

"মহাজনরা বেশির ভাগ হিন্দু, আর পঞ্জাবের জন-সংখ্যার বেশির-ভাগ মুসলমান। মন্ত্রীরা ঠিক করেছেন পুরাতন ঋণ সব সাফ ক'রে দেওয়া হবে। এ সিদ্ধান্ত তাঁরা নিয়েছেন শুধু এজন্যে যে মহাজনরা হিন্দু। তাঁরা এক ঢিলে দু পাখী মারছেন : হিন্দুদের দুর্বল করছেন, মুসলমানদের খুশী। এর মধ্যে বেধে গেল তোমার ঐ গড় হরিদাস-পুরের হামলা। এর থেকেই আমাদের আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। চাষীদের ঋণ-মুক্ত করতে আমরাও চাই—এ সুযোগ লীগকে বা অন্য

কাউকে দিলে চলবে না। তা ছাড়া, লীগের কাগজগুলিতে যাকে 'সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা' বলা হয়েছে আমরা তাকে অন্য রকম বললে আমাদের রাজনৈতিক প্রভাব কমে যাবে।"

পৃথ্বিরাজ কোশল দাঁড়িয়ে পড়ল শুনতে শুনতে। আবার আগ্নেয়-গিরির জ্বলন্ত বহ্নির মত জ্বালাময় পদার্থ তার অন্তর ভেদ ক'রে উঠে আসতে চাইল। বুঝতে পারল, ভয়ংকর রেগে যাচ্ছে সে। সমস্ত দেহ লোহার মত কঠিন হল, নিঃশ্বাস আটকে এল, মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। শত সূক্ষ্ম উপশিরায় রক্ত ছুটে এসে বড় বড় চোখ দুটোকে লাল করে দিল। মুখটা বিকৃত হ'য়ে গেল।

প্রচণ্ড অগ্নিস্রোত গলায় এসে আটকেছিল। পৃথ্বিরাজ ঝড়ের মত সুরেন্দর-ভাই-এর বৈঠকখানা হ'তে নিষ্ক্রান্ত হল। শুধু এক ঝলক আগুন বেরিয়ে এল তার মুখ থেকে: "আপ্ সব্ ঝুট্ হ্যায়।"

পরের দিন জনসভায় সুরেন্দর চমৎকার বক্তৃতা করলেন। কংগ্রেস কোনও সম্প্রদায়ের নয়, সমস্ত জাতির। তার কাছে হিন্দুও যা, মুসলমানও তা। উভয়ের দুষমন ইংরেজ, কিন্তু তাকেও কংগ্রেস ঘৃণা করে না, শুধু তার শাসনকে অস্বীকার করে। লীগ সাম্প্রদায়িকতার বিষ ভারতের দেহে ছড়িয়ে দিয়েছে, এ বিষক্রিয়া বন্ধ করা কংগ্রেসের অন্যতম প্রধান কর্তব্য। গড় হরিদাসপুরে লীগের এজেণ্টরা সাম্প্রদায়ি-কতার আগুন জ্বেলেছে। কংগ্রেসকে নেবাতে হবে এ আগুন। লীগের কার্যকলাপে উভয় সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে গেছে, এ সময়ে এমন কোনও আইন প্রণয়ন করা ঠিক হবে না, উদ্দেশ্য তার যতই শুভ হোক, তাতে সাম্প্রদায়িক সম্ভাবনা নষ্ট হ'তে পারে।

সুরেন্দর-ভাই বিপুল জনতার উচ্ছ্বসিত করতালির মধ্যে বক্তৃতা শেষ ক'রে সন্তুষ্টচিত্তে আসন গ্রহণ করবেন, এমন সময় একটি যুবক কোথা থেকে ছুটে এসে চেঁচিয়ে উঠল, "ভাই সব, ইনি যা বললেন, সব ঝুট, সব মিথ্যে।"

অবাক হ'য়ে সুরেন্দর-ভাই দেখলেন, পৃথ্বিরাজ কোশল।

জনতার মধ্যে চাঞ্চল্য এল। সভাপতি আগন্তুককে বলবার অনুমতি দিলেন না। চারদিক থেকে স্বেচ্ছাসেবকরা ছুটে এসে তাকে পাকড়াল। তবু সে চেঁচিয়ে বলে চলল, "আমি জানি, এ সব মিথ্যে। উনিও জানেন, এ সব মিথ্যে। আমাকে বলতে দিন, আমি দশ বছর কংগ্রেসের কাজ ক'রে আসছি, আমাকে বলতে দিন।..............."

বলতে সে পেল না। জনতার একদল চেঁচিয়ে উঠল, পাগল। আর একদল বলল, ওকে বলতে দিন। স্বেচ্ছসেবকরা পৃথ্বিরাজকে মঞ্চের বাইরে নিয়ে গেল। সভাপতি সভা শেষ ঘোষণা করলেন।

এক মাস পরে পৃথ্বিরাজ বিনা বিচারে বন্দী হল।

সংসারে একটি মাত্র প্রাণীর জন্যে আন্তরিক টান ছিল পৃথ্বিরাজের। সে বোন সীতা। দাবা-খাবা মানুষ, স্নেহ-ভালবাসা পৃথ্বিরাজ খুব একটা দেখাতে পারে:না। সীতাকে সে কোলে পিঠে মানুষ করেছে, সীতা তার অনেকখানি। জীবনের জৈবিক তৃষ্ণা তার কম, সব দিকে পৃথ্বিরাজ মিতাহারী, সঞ্চয়ী। রোজগার কোনওদিন বেশি করে নি, তবু নিজের প্রয়োজন কম বলে, কিছু কিছু সঞ্চয় করেছে। ভেবেছে সীতার বিয়েতে লাগবে। মামাবাড়ী টাকা পাঠিয়েছে সীতার পড়া যাতে থেমে না যায়; সুযোগ পেলেই বোনকে দেখে এসেছে। সীতা সুন্দরী, তার মুখে বিস্মৃত প্রায় মায়ের মুখখানা প্রচ্ছন্ন। সীতা প্রাণের আবেগে উচ্ছল, পড়াতে মন না থাকলেও কোনবার ফেল করে না, ধাপে ধাপে এখন পৌঁচেছে কলেজে। তাকে দেখলে মনে হয় না কোন বড় বন্ধন তার আছে; মনে হয় সুযোগ পেলেই সে ছুটে বেরিয়ে পড়বে জীবনের প্রান্তরে।

দ্বিতীয়বার জেল থেকে ছাড়া পেয়ে পৃথ্বিরাজ ভাবল এবার সীতার বিয়ে দিতে হবে। সীতার বিয়ে মানে তার মুক্তি।

পৃথ্বিরাজ আরও দেখল পঞ্জাবে এক অদ্ভুত অবস্থা। সাম্প্রদায়িকতায়, পঞ্জাবী মানস জর্জর। দলাদলী ও মিথ্যাচারে রাজনৈতিক

দেহ বিষাক্ত। এরই মধ্যে প্রবীণ গান্ধীপন্থী নেতা সুরেন্দর-ভাই বেশ জাঁকালো আসর পেতে বসেছেন। ভবিষ্যতে যে তিনি মন্ত্রী হবেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। নিজেও সে কংগ্রেস কর্মী, তাই হাজির হল সুরেন্দর-ভাই-এর আসরে। বিশেষ পাত্তা পেল না। আপাততঃ প্রয়োজন কর্মের। সুযোগের অপেক্ষা করল পৃথিরাজ কোশল।

যুদ্ধ লেগেছে। চাকরীর বাজার গেছে খুলে। পৃথিরাজের অবশ্যি সহজে চাকরী হল না, কিন্তু সীতা কাজ পেয়ে গেল ফিরোজ-পুরে যুদ্ধ-প্রচার দপ্তরে। পৃথিরাজ ভাবল, ভালই হল, সীতা নিজের অভাব মিটিয়ে যদি কিছু সঞ্চয় করে, ভবিষ্যতে কাজে লাগবে। জেলখাটা কংগ্রেসী ব'লে সরকারী চাকুরী তার জুটল না, কিন্তু কাজ একটা শেষ পর্যন্ত যোগাড় হল। সুরেন্দর-ভাই-এর বাড়ীতেই আলাপ হ'য়েছিল লালা গোপালদাসের সঙ্গে, হরেক সাইজের 'গোপাল ঘি' টিনে যার ছবি সর্বত্র পরিচিত। সুরেন্দর-ভাই তাকে উপেক্ষা করলেও গোপালদাস একদিন ডেকে পাঠাল, খাতির করল।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর প্রশ্ন করল, "কী করছ এখন ?"

"কিছু না।"

"তাহলে চলছে কী করে ?"

"আঙ্গুল চুষে।"

"কাছ করবে ?"

"কাজ কোথায় ?"

"কেন! যুদ্ধের বাজারে কাজের অভাব কী ?"

"আমার মত লোকের জন্য খুবই অভাব।"

"আমি তোমাকে কাজ দিতে পারি।"

"কী কাজ ?"

"আমার ব্যবসায়ে।"

"চোরা কারবার আমি করতে পারবো না।"

"বেশ তো। তুমি খোলা কারবারই করবে।"

"কিসের করবার ?"

"আমি নানা রকমের কনট্রাক্ট পাচ্ছি। ধরো সৈন্যদের খাদ্য সংগ্রহের। আবার, এরোড্রোম বানানোর। কোথাও বা ব্যারাকস্ তৈরী করার।"

"আমাকে কী করতে হবে ?"

"আমার ছেলে লছমনদাস সৈন্যদের ব্যারাকস্ বানায়। তুমি তাকে সাহায্য করবে।"

"কী ধরণের সাহায্য ?"

"মজদুর জোগাড় করা। কাজকর্ম দেখা। মাল-মশলা কেনা।"

"কতো মাইনে পাবো ?"

"ভালই পাবে। দুশো।"

কংগ্রেস-সমর্থক লালা গোপালদাসের পুত্র লালা লছমনদাসের সহকারী হয়ে কাজ শুরু করল পৃথ্বিরাজ। প্রথম প্রথম মন্দ লাগল না। কিন্তু কয়েক মাস যেতে সে টের পেল কত পাঁকের মধ্যে ডুবে তবে তার কাজ। টের পেল ঘুষ আর মদ আর মেয়েমানুষের তেল খেয়ে কাজের চাকা ঘোরে, কুলি কামিনের গায়ের ঘামে নয়, লেবার বাবুর মেহনতে নয়। বড় বড় চোখে সে দেখল কেমন নির্বিকার চিত্তে মানুষ অন্যায় করে, পাপ করে, ঘুষ দেয়, ঘুষ নেয়। দেখল কী ব্যাপক ব্যাধি দেশকে গ্রাস করেছে, সবাইকে গ্রাস করেছে। পৃথ্বিরাজ রাগে জ্বলে গেল, কিন্তু এ রাগ যেন অন্য জাতের, বড় তাড়াতাড়ি নিভে যায় ; দুর্বল, স্বল্পায়ু রাগ।

একদিন সন্ধ্যায় লছমনদাস তাকে ডেকে বলল, "একটা কাজ এক্ষুনি করতে হবে।"

"হুকুম করুন।"

"এই চার বোতল হুইস্কি পৌঁছতে হবে হপকিন্‌স্ সাহেবের কুঠিতে।"

"হুইস্কি কেন ?"

পান ক'রে লছমনদাস নিজেই বেশ বেসামাল ছিল। চেঁচিয়ে উঠল, "তা দিয়ে তোমার কাজ নেই। যা বলছি তাই করো।"

পৃথিরাজের মাথাটা হুট করে জ্বলে উঠল, কিন্তু আগুন কেমন যেন সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ল না। একটু চুপ থেকে বলল, "জী"।

"আরও একটা জিনিষ আছে।"

"কী ?"

"বাইরে গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। গাড়ী নিয়েই যাও। গাড়ীর মধ্যে দেখবে আর কী আছে। সেটাও হপকিন্‌স্ সাহেবের। দেখো, নিজেই আবার দখল করে বোসো না। যাও।"

শেষ কথাগুলি বলল লছমনদাস টেনে টেনে, হেসে হেসে।

গাড়ীর দরজা খুলে পৃথিরাজ প্রায় মূর্ছা গেল। দেখল পেছনের সীটে ব'সে আছে একটি মেয়ে, দেখতে কিছুটা সীতার মত, বয়সে নিশ্চয় বড়, তথাপি যৌবনে প্রভাবতী। পরিপাটি ক'রে সেজেছে, নিজেকে যতটা সম্ভব প্রগল্‌ভ করেছে। এই সেই "আর একটা জিনিষ"। একেও তাহলে পৌঁছে দিতে হবে হপকিন্‌স্ সাহেবের হাতে, চার বোতল মদের সঙ্গে! আর একে লক্ষ্য করেই অমন টানা টানা জড়ালো হাসির সঙ্গে বলেছিল লছমনদাস, দেখো, নিজেই আবার দখল ক'রে বোসো না!

পা চলল না পৃথিরাজ কোশলের। চোখে আগুন লাগল, আগুন জ্বলল মাথার মধ্যে, বুকে। ছুটে গেল লছমনদাসের দপ্তরে। দেখল, ঘর শূন্য। চার বোতল মদ ও আস্ত একটি মেয়ে তার জিম্মায় সপে দিয়ে অর্ধ-সচেতন লালা লছমনদাস নতুন কেনা ক্রাইসলারে চড়ে বেরিয়ে গেছে।

ফিরে এল পৃথিরাজ গাড়ীর কাছে। চতুর্দিকে অর্ধ-নির্মিত ব্যারাক্স অদূরে ঝুপড়ি তৈরী ক'রে কুলি কামিনরা বাস করছে। তারা ছাড়া আর কেউ কোথাও নেই। সহরের বাইরে তৈরী হচ্চে সৈন্যদের ছাউনি। অন্ধকার নেমেছে, মৃত্যুর মতো যবনিকার মূর্তিতে। ঝুপড়ি

পেরিয়ে মাঠ, এখন কেবল তরঙ্গের পর তরঙ্গ অন্ধকার। ঐ যে রাস্তা, যার দু'পাশে বিজলী বাতি, ঐ রাস্তার শেষ প্রান্তে হপকিন্‌সের কুঠি। ছ' ফুট লম্বা, আড়াই মণ ওজনের হপকিন্‌স্‌, সারা মুখে ছোট ছোট দাগ, যেমন কর্কশ গলা, তেমনি কুৎসিৎ মেজাজ, তেমনি নিষ্ঠুর স্বভাব। আসলে এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, রংটা ম্যাট-মেটে শাদা, চোখ দুটো সামান্য নীল; বলে পাকা সাহেব। ব্যারাকগুলি অনুমোদন ক'রে টাকা পাইয়ে দেবার মালিক হপকিন্‌স্‌। তার সপ্তাহের উপরি চার বোতল হুইস্কি, একটি নতুন মেয়ে।

পৃথিরাজ কোশল কিছুক্ষণ হতবুদ্ধি হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর ঝট ক'রে গাড়ীর দরজা খুলে, কর্কশ গলায় বলল, বেরিয়ে আসুন।

বড় বড় একজোড়া চোখ নিষ্প্রভ দৃষ্টি পৃথিরাজের মুখের ওপর রেখে গাড়ী থেকে বেরিয়ে এল। চোখের পেছনে এল একটি মেয়ে, বয়স বাইশ-তেইশ, সুন্দর দেহ সাজে নির্লজ্জ, সুন্দর মুখ ভাবলেশহীন, এখন বিস্ময়ে, সামান্য ভয়ে, কুঞ্চিত।

আধ-অন্ধকারে পৃথিরাজ পুরোপুরি তাকে দেখতে পেল না। দেখবার ইচ্ছেও হল না। সে বলল, "এভাবে নিজের সর্বনাশ করছেন কেন?"

নির্বিকার স্বরে, ভ্রু দুটি বাঁকা ক'রে, মেয়েটি জবাব দিল, "সর্বনাশ অনেকদিন হ'য়ে গেছে। কী চাই আপনার। উপরি?"

পৃথিরাজের বুক কাঁপল, মাথায় আবার আগুনের প্রদাহ লাগল। সে বলল, "আমার দ্বারা তোমাকে নরকে পৌঁছান হবে না।"

মেয়েটি নিরুত্তাপে বলল, "হতেই হবে। না নিয়ে গিয়ে আপনার উপায় নেই। না গিয়ে আমার গতি নেই।"

পৃথিরাজ বলল, "আমি চাকরী ছেড়ে দেব। কিন্তু তোমার উপায় নেই কেন?"

এক পা এগিয়ে মেয়েটি বলল, "আমি এ কাজ ছাড়বো না। ছাড়া হবে না। বাবা মারবে। বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেবে। নয়তো, বাড়ীতেই ডেকে আনবে যারা টাকা দেয় তাদের।"

পৃথিরাজ দেখল অন্ধকারের পাহাড় দাঁড়িয়েছে তার চারদিকে। বড় করুণ অন্ধকারের আস্তরণ। প্রিয়জনের মৃত্যু হলে বুঝি এমনই অন্ধকার চারদিকে ঘিরে আসে। বড় করুণ অচেনা, এই দেহ-ব্যবসায়িনী মেয়েটি। পৃথিরাজের মাথায় আগুন নিভে গেল, বুকে প্রদাহ রইল না, নিদাঘ-তুপুরের তপ্ত দহন গলা অবধি উঠে এল না। কান্না পেল। হাত তুটো ঠাণ্ডা হয়ে এল, পা কাঁপল, অন্তরে ঢুকল বিষণ্ণ করুণ অন্ধকার।

তার রাগ আর নেই। রাগতে সে আর পারল না।

রাগ নেই। রাগের বদলে পৃথিরাজ কোশলের মনে ঢুকল নতুন জিনিষ, জীবনে প্রথম। তার নাম ভয়। লালা লছমনদাস সৈন্যদের ব্যারাক বানাচ্ছে, আর ধনী হচ্চে; লালা গোপালদাস ঘি-তে চর্বি মেশাচ্ছে আর ধনী হচ্চে; স্নুরেন্দর-ভাই আদর্শবাদের সঙ্গে রাজনীতির জটিল ঘোরপ্যাঁচ মিশিয়ে ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষে নিজের স্থান তৈরী করছেন:

আর সে পৃথিরাজ কোশল, দোকানে খাতা-লেখক গঙ্গাধর কোশলের স্নুপুত্র, প্রথম যৌবনে ভারতবর্ষকে 'মা' ডেকে স্বদেশীতে দীক্ষা নিয়েছিল, 'বন্দে-মাতরম' চেঁচিয়ে ওঠার অপরাধে তার ছাত্র-জীবনের অবসান; বার বার সে জেলে গেছে; চাষীদের কাছে কংগ্রেস ও রাজনীতির প্রাণ জ্বালান বাণী পৌঁছে দিয়েছে; যা মিথ্যা তাকে সত্য বলে গ্রহণ না করার অপরাধে মার খেয়েছে, হৃতমান হয়েছে: সেই আমাকে, পৃথিরাজ কোশলকে, তুশো টাকার চাকরীর খাতিরে, বিষণ্ণ, সকরুণ সন্ধ্যার আড়ালে একটি স্নুন্দরী দরিদ্র মেয়েকে পৌঁছে দিতে হচ্চে মাতাল পুরুষের কাছে:

কে, কারা, কি ক'রে, এমন অসম্ভবকে সম্ভব করল?—

কে, কারা, এমন অবস্থা তৈরী করল, যাতে এই স্নুন্দরী মেয়েটিকে দেহ বিক্রী করে বাপের হাতে পয়সা তুলে দিতে হয়, না দিতে পারলে বাপ তাকে মারে, নয়তো বাড়ীতেই লোলুপ পুরুষ ডেকে এনে তার নখদন্তের সামনে মেয়েকে ঠেলে দেয়:

এ যে সেই ভয়ানক কুটিল সর্বগ্রাসী সর্বনাশ যা আমাকে, পৃথিরাজ কোশলকে, টেনে নীচে নামিয়েছে, যা এই অজানা মেয়েটিকে নোংরা করেছে, যা লালা লছমনদাসকে হীন করেছে, লালা গোপাল দাসকে অসৎ করেছে, সুরেন্দর-ভাইকে যোগভ্রষ্ট করেছে ঃ

সে সর্বনাশ কি একদিন আরো সর্বব্যাপী হ'য়ে কী গ্রাস করবে আরো অনেককে, সবাইকে—আমাকে, আমার বোন সীতাকে ?

ভয়। ভয় হ'ল পৃথিরাজ কোশলের ; রাত্রির অন্ধকারের মতো ভয় ; মৃত্যুর মতো ভয়। দুর্ভিক্ষের ক্ষুধার মতো ভয়। ভয়ে গলা আটকে এল। হাত-পা হিম হল।

মেয়েটি গাড়ীতে গিয়ে বসেছে। হিমশীতল হাত-পা নিয়ে পৃথিরাজ কোশল গাড়ীতে ষ্টার্ট দিল। গাড়ী চলল হপকিন্‌স্ সাহেবের কুঠির পথে।

অন্ধকারে কুটিল-গতি বিষধর বৃশ্চিক।

স্রোতস্বিনী

মার্গারেট কাপুরের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা পাঁচ বছর আগে।

রাত্রিবেলা আপিসে কাজ করছি, এমন সময় সহকর্মী সুরেশ বাজপাই ঘরে ঢুকল। সঙ্গে তার এক বিদেশী নারী। বড় বিষাদ-করুণ মুখখানা, মাথায় একরাশি অবিন্যস্ত সোনালি চুল। কোন মেক-আপ নেই ; ওষ্ঠাধর পর্যন্ত অরঞ্জিত।

সুরেশ বাজপাই পরিচয় করিয়ে দিল। "ইনি হচ্ছেন মিসেস কাপুর, আমাদের নবতম সহকর্মী। আজই কাজে যোগদান করলেন।"

উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করে নমস্তে করলাম। মিসেস কাপুর আনমনা একটা প্রতিনমস্কার জানিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। বললাম, "বসুন।"

বসেই রইলেন। সে নীরবতা এত বিষণ্ণ যে, আমরাও কথা বলতে পারলাম না। সুরেশ বাজপাই রসিক মজাদার মানুষ, সবসময়েই ইয়ার্কি দুষ্টুমি করা তার স্বভাব। সেও কৌতুক করার সুযোগ পেল না।

কথা বলতেই হয়, তাই শুধালাম, "আজই এসেছেন এখানে?"

মৃদু স্বরে জবাব এল, "হ্যাঁ"

"কাজ বুঝে নিয়েছেন?"

"একটু আধটু।"

"আশা করি আপনার ভালো লাগবে।"

মিসেস কাপুর কোন সাড়া দিলেন না। সুরেশ বাজপাই হঠাৎ উঠল।

"তোমরা একটু গল্প কর, আমার কাজ আছে", বলে সটান বেরিয়ে পড়ল।

আমি ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলাম মিসেস কাপুরকে। মুখখানা সুন্দর। অন্তত এককালে বেশ সুন্দর ছিল। মেম সাহেব, তাই রং খুব সাদা, কিন্তু ফ্যাকাশে সাদা নয়, এবং চামড়ায় ছিট ছিট দাগ নেই। দাঁতগুলি ঝকঝকে, সমান লাইনে সুবিন্যস্ত; নকল যদি না হয়, অবশ্যই সুন্দর। ভ্রূ বলতে বিশেষ কিছু নেই; চোখ দুটি বড় বড়, নীল। পাতলা, সুগঠিত নাক, ডান পাশে ফিকে-কালো ছোট্ট একটি আঁচিল। ভরা-সরা গাল দুটি নেমে এসে কোমল চিবুকে যেখানে মিলেছে, সেখানে ছোট্ট একটি ভাঁজ। এককথায়, মিসেস কাপুর সুন্দরী।

কিন্তু সে সৌন্দর্যের ওপর বিষাদের এমন আস্তরণ যা তাঁর কালো রংএর পোষাকের সঙ্গে মিলে মিশে ব্যাপক নিরানন্দের আবহাওয়া সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। নীল চোখে দীপ্তি নেই, পাতলা ঠোঁটে হাসি নেই, কথাবার্তায় প্রাণ নেই। এঁর সঙ্গে না চলে বাক্যালাপ, না দেওয়া যায় এঁকে বিদায়।

"এর আগে কোথাও কাজ করেছেন?" নীরবতা ভাঙ্গবার জন্যে প্রশ্ন করলাম।

"না।"

"তাহলে হঠাৎ কাজ করার ইচ্ছে হ'ল?" একটু হেসে, হাসি ফোটাবার চেষ্টা করলাম।

"না।"

চুপ করে যেতে হল। এক-শব্দের জবাবে বাক্যালাপ চলে না।

বোধ হয় আমার অবস্থা বুঝলেন। তাই মৃদু স্বরে আনমনে বললেন:

"আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, তাই আমাকে কাজ করতে হচ্চে।"

চাবুক খেলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, তাইতো। ইনি যে ভগবান কাপুরের স্ত্রী, যিনি কিছুদিন আগে মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন! ব্যারিস্টার ভগবান কাপুর, যত না পসার ছিল তত ছিল সামাজিক

প্রসার। গাড়ি ক'রে আগ্রা থেকে ফিরছিলেন, পথে দুর্ঘটনায় হতচেতন হ'য়ে হাসপাতালে মারা গেছেন। এইতো মাস তিনেকের কথা। তাঁর স্ত্রী মার্গারেট কাপুর, একদিন সোসাইটিতে যাঁর হাক-ডাকের সীমা ছিল না, আজ তিনি ঢুকেছেন কর্মজীবনে! দূর থেকে আমরা কাপুর-বাড়ির ঝলমলে পার্টির গল্প শুনেছি, শুনেছি সেখানে নিত্য বড় মানুষদের আনাগোনা, আহার-বিহার, নাচ-গানের গল্প। ভগবান কাপুর ধনবান ছিলেন না, রুচিবান ছিলেন; কিন্তু এতোই কি তিনি ক্ষীণবিত্ত ছিলেন যে, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিদেশিনী স্ত্রীকে জীবিকার সন্ধান ক'রতে হচ্চে ?

হঠাৎ মনে হল, মহিলার বয়স কত ? ভগবান কাপুর বৃদ্ধ ছিলেন না, কিন্তু ভারতীয় মানে দস্তুরমত প্রৌঢ় ছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে খবরের কাগজে তাঁর বয়স তিপান্ন জানান হ'য়েছিল। তিপান্ন বছরের স্বামীর দেশী পত্নী চাই কি তেত্রিশ হ'তে পারেন, কিন্তু মার্গারেট দেশী নন। কিন্তু এ কৌতুহল নিজের কাছেই একটু অশালীন মনে হল।

বললামঃ "বড় দুঃখিত। আমায় মাপ করবেন। আপনার স্বামীর মৃত্যুর খবর কাগজে পড়েছিলাম। বড় দুঃখের ব্যাপার। আপনিই যে তাঁর স্ত্রী তা বুঝতে পারিনি।"

মার্গারেট কাপুর নীরব রইলেন।

"জীবনটা বড় কঠিন ঠাঁই, মিসেস কাপুর", আমি স্বভাবসিদ্ধ ভারতীয় উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করলাম। "কখন কার যে কি হয় বলা যায় না।"

দর্শনতত্বে মার্গারেট কাপুর বিন্দুমাত্র উৎসাহ প্রকাশ করলেন না। টেবিলের উপর তাঁর একখানা হাতে আমার নজর পড়ল। সরু সরু পিয়ানোর রীডের মত আঙ্গুলগুলি বিষাদে বিবর্ণ। সামান্য কম্পমান।

একটু ঝুকে মিসেস কাপুর কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। পরিষ্কার বুঝলাম, আবেগ সামলে নিলেন। একবার ঢোক গিললেন,

জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজালেন। তারপর চাপা স্বরে বললেন: "কাজ করতে কি আমার খুব কষ্ট হবে?"

"একটু তো হবেই।" আমি বাস্তব ভঙ্গিতে বললাম। "কিন্তু, মনে হচ্ছে, অল্প ক'দিনেই আপনার প্রাথমিক অসুবিধা চলে যাবে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান রিপোর্ট করার কাজে আনন্দ ও তৃপ্তির সুযোগ আছে।"

"সেটাই তো একমাত্র ভরসা। কিন্তু রোজ রাত বারোটা পর্যন্ত কাজ করতে হবে! ভাবতে আমার শরীর ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে।"

এতক্ষণে কয়েকটি শব্দ একসঙ্গে উচ্চারণ করে মিসেস কাপুর যেন কিঞ্চিৎ ভরসা পেলেন।

"কাজ না করলে বোধকরি আপনার আরও খারাপ লাগবে", আমি উদারতার সঙ্গে যোগ দিলাম।

"কাজ না করে আমার উপায় নেই। নইলে কি আমি চাকরির জন্যে এ বয়সে কোথাও যেতাম?"

ভদ্রতার সীমা ইচ্ছে করেই লঙ্ঘন করলাম।

"বয়স কত আপনার?"

"চুয়াল্লিশ?"

"এমন কিছু বয়স নয়।" উদার হলাম আর একটু। "আপনি ভারতীয় নন যে, কুড়িতে বুড়ী।"

"রোজ রাত জেগে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে যাবে না?"

"যত্ন নিলে কেন যাবে? রোজই আপনাকে বারোটা পর্যন্ত জাগতে হবে না।"

"তাই নাকি? আগে তো ক্লাবে কতদিন বারোটা পেরিয়ে ঘরে ফিরেছি। কিন্তু সে ছিল অন্যদিন। তখন কোনও দিন কি ভেবেছি আমায় কাজ ক'রে খেতে হবে?"

বলতে বলতে গলা ধরে এল মিসেস কাপুরের। নিজেকে সামলাতে প্রাণপণ চেষ্টা করেও তিনি হেরে গেলেন। দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন টেবিলের ওপর মাথা রেখে।

আমি একটা রচনা শুদ্ধিতে মন দিলাম।

কান্না থামলে লজ্জিত হলেন মার্গারেট কাপুর। রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। দুহাত দিয়ে সোনালি চুলের অবাধ্য তরঙ্গ শাসন করলেন। আরপর বললেন, "মাপ করবেন। বড় বোকামি ক'রে ফেললাম।"

"আমার কিন্তু নিজেকে প্রায় ঠাকুর্দার মত মনে হচ্ছিল", বলে আমি হাসলাম।

ক্ষীণ হাসির জীর্ণ আলো পড়ল ব্যথাতুর মুখে।

বছর খানেকের মধ্যেই মার্গারেট কাপুর পুরোপুরি আত্মস্থ হলেন।

একদিন সন্ধ্যের পর একটা স্ক্রিপ্ট দেখাতে আমার ঘরে এলেন মিসেস কাপুর। এলেন না, আবির্ভূতা হলেন। দামী বিদেশী সৌরভে ঘর ভরে গেল।

"অমন জোরে জোরে নিঃশ্বাস কেন?" মিসেস কাপুর চেয়ারে জমাট হ'য়ে স্মিতমুখে শুধালেন।

"আমাদের রসশাস্ত্রবিদরা বলেছেন, ঘ্রাণে অর্ধভোজন"; আমি বললাম। "এ সৌরভটা কোন দেশী বলুন তো।"

কথাবার্তায় নিজে যেমন রসিকা, মিসেস কাপুর তেমনি অপরের মধ্যে বুদ্ধির চাতুর্য ও রসিকতাবোধ দেখলে খুশি হন। কথা বলেন হাত-পা-চোখ নেড়ে, শরীর দুলিয়ে, নাটকীয় ভঙ্গিতে; হাসেন উচ্ছসিত কণ্ঠে; যেহেতু তিনি বিদগ্ধা রমণী, তাই পুরুষ-সমাজে সচরাচর যা হয়ে থাকে, সে ধরণের অশ্লীল আলোচনা হলেই লাল হন না, উঠে পালান না। শুধু মৃদু হেসে হতাশার সুর কণ্ঠে এনে বলেন, 'ইউ মেন্...।'

"একেবারে খাস প্যারিসের।"

"হবেই। এত সৌরভ ছড়িয়ে রাস্তায় নিরাপদে চলেন কি করে?"

"নিরাপদে? নিরাপদে দিল্লির রাস্তায় কোন ভদ্ররমণী চলতে পারে?" মিসেস কাপুর সামান্য উত্তপ্ত হলেন। "দেখুন না আজই কি হল। বাসে আপিসে আসছি, পাশের সীট-টা খালি ছিল। এসে বসল এক সর্দারজী। অমনি তার গা থেকে সব রাসায়নিক সুগন্ধ নির্গত হ'তে লাগল। এবার বুঝতে পারছেন, কেন এই উগ্র সৌরভ নিয়ে চলতে হয়? এ হচ্চে আত্মরক্ষা, স্রেফ আত্মরক্ষা। আমিতো জানলার দিকে স'রে বসে বাইরের দিকে চোখ ফিরিয়ে কোনওমতে পথশেষের অপেক্ষা করছি, এমন সময় সর্দারজী গরম হয়ে উঠলেন। প্রশ্ন হল, মাদাম, আপনি কি জার্মান? না-শোনার ভাণ করলাম। প্রশ্নকর্তা অত সহজে দমবার নন। এবার উত্তর দিতেই হল, বললাম, না। 'তবে কি আপনি ইংলিশ?' আবার বললাম, না। 'ও তাহলে আপনি বুঝি রাশিয়ান?' দেখুনতো, কতবড় আহাম্মক, কতখানি স্পর্ধা। আমাকে বলে রাশিয়ান! এবার কড়া জবাব দিতেই হল। একেবারে লোকটার মুখোমুখি হ'য়ে বললাম 'না'। আমি রাশিয়ান নই। আমি কে আপনার জানবার কোন দরকার নেই। অনুগ্রহ করে আমাকে গন্তব্য স্থান পর্যন্ত শান্তিতে যেতে দিন। কিন্তু, কী জ্বালা, লোকটার একটু লজ্জা হল না! দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে হাসতে লাগল!"

এখানে দু একটা কথা বলে রাখা ভাল। মিসেস মার্গারেট কাপুর একদা 'ইংলিশ' ছিলেন। ভারতবর্ষে পঁচিশ বছর কাটিয়ে তিনি ভারতীয় ছাড়া অন্য পরিচয় দেন না। এসেছিলেন পঁচিশ বছর আগে একটি পঞ্জাবী যুবকের ধর্মপত্নী হয়ে। তাঁর সঙ্গে বছর পনের অত্যন্ত সুখী দাম্পত্য জীবনযাপন ক'রে, ভগবান কাপুরকে দেখে তাঁর অন্তরে প্রভঞ্জন ওঠে। প্রথম স্বামীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটিয়ে তিনি মিসেস কাপুর হন। দশ বছর তাঁরা পরম সুখে ঘর করেন। তারপর মোটর দুর্ঘটনায় ভগবান কাপুরের মৃত্যু হ'লে জীবনে তিনি

প্রথমবার বিধবা হন। ঘটনাবহুল জীবনে মার্গারেট কাপুরের একটি ঘটনা একেবারে হয় নি ; সন্তান। তিনি কোনও দিন মা হতে চাননি। অর্থাৎ চাইলে হতে পারতেন।

আমি সহানুভূতি জানিয়ে বললাম, "সুন্দরী মহিলাদের পথে একা চলাফেরা বড় কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।"

"কঠিন নয়, অসম্ভব", তিনি জবাব দিলেন। "বিশেষত সে মহিলা যদি বিদেশী হন। এদেশের লোকেরা বিদেশী স্ত্রীলোক দেখলেই কেমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। যেমম বিশ্রী, তেমনি নীচ দৃষ্টি।"

"একটা গাড়ি কিনে ফেলুন না।"

"গাড়ি? তাও অনেক ভেবেছি। বারো চোদ্দ হাজার টাকা দিয়ে গাড়ি কিনবো, কিন্তু তাতে লাভ কি? তার পেছনে কত ঝামেলা, কত খরচ। আজ এটা খারাপ হল, কাল ওটা চুরি গেল, পরশু সার্ভিসিং ; অর্থাৎ তুমি বন্দী হ'লে একপাল ঠক-জোচ্চোরের হাতে। তারপর, কোথায় রাখি? যেখানে বাস করি, জানেনতো, সেখানে গ্যারেজ নেই। গাড়ি বাইরে প'ড়ে থাকবে আর আমার চোখে ঘুম আসবে না চিন্তায়। এসব ভেবে গাড়ি কেনার মত বোকামি করতে রাজি নই। তাছাড়া, (একটু ব্যথার হাসি হেসে বললেন) ভদ্রমহিলারা ভদ্রমহোদয়দের দ্বারা চালিত গাড়ি চড়তে অভ্যস্ত, যেমন আমি সারা জীবন ছিলাম।"

"সেজন্যেই তো আপনার কষ্ট আরও বেশি।"

"সে কথা বলে আর কি হবে? আমার প্রথম স্বামীর চারখানা গাড়ি ছিল, একখানা, একটি চমৎকার রোভার, কেবল আমার জন্যে। শুধু ওটাই তিনি নিজে চালাতেন। তিনটার জন্যে তিনজন সোফার। মিঃ কাপুর ব্যবসায়ী ছিলেন না, কিন্তু যা রোজগার, দুহাতে খরচ করতেন। আমাদের মস্ত একটা 'শেড' ছিল, তার মেরামত, সাফ, সবকিছু নিজের হাতে করতেন তিনি। ঐ ছিল তাঁর

ছবি। দুর্ঘটনায় গাড়িটা ভয়ংকর আঘাত পেয়েছিল। বীমা কোম্পানীর খরচে সারান হল, কিন্তু অতবড় গাড়ি দিয়ে আমি কি করবো? জলের দামে বেচে দিলাম।"

"ভালোই করেছেন। নয়তো একদিন লোহার দামে বেচতে হত।"

মিসেস কাপুর উঠি-উঠি করলেন। আমি বললাম, "আপনার লেখাটা ঠিকই আছে, এক আধটু অদল-বদল করে দিলাম। তা উঠি-উঠি করছেন কেন? ডেট্ আছে নাকি?"

"ডেট্! মাই গড! ওসবের আর বয়স নেই, সময়ও নেই। রাত বারোটা পর্যন্ত চাকরি করে ঘরে যাই। কোনও মতে বেশ বদল করে বিছানায় শুয়েই ঘুম! শুধু শোবার আগে পালংকের নীচে, কাবার্ডে, একবার দেখে নেবার সময়টুকু ক'রে নি।"

"পাছে কোনও পুরুষ লুকিয়ে থাকে?"

"না, মশাই না। ওরকম রোমান্টিক কিছুই নয়। ইঁদুর, স্রেফ ইঁদুর।"

সেই প্রথম দর্শনের মিসেস কাপুর আর নেই। বোধকরি আমার মনেই সে বিষাদ-ক্লিষ্ট অসহায়, ভীত-সন্ত্রস্থ প্রসাধন-বিহীন মুখখানার একটা আবছা ছাপ লেগে রয়েছে। মার্গারেট কাপুর নিশ্চয় সে মুখখানা একেবারে ভুলে গেছেন।

এখন কোন দিন তাঁকে দেখা যায় না একটি পোষাক দুদিন পর পর পরতে। সোনালি চুলে এখন অস্থায়ী তরঙ্গ। সুন্দর দুটি সরু ভ্রূ চোখের বাঁ-কোণ থেকে ডান কোণ ছাড়িয়ে বক্র-রেখায় কানের দিকে প্রসারিত। প্রসাধনের কল্যাণে ত্বক মসৃণ, একটি দাগও নেই। ওষ্ঠাধারে দামী রক্তিম প্রলেপ; চিবুকের সুন্দর ভাঁজটির ওপর চকচকে একটি কালো তিল, প্রথম দিন যা চোখে পড়েনি। বেশবাসে মিসেস কাপুর অত্যন্ত শালীন ও রুচিশীল। আভিজাত্যবোধ আছে, এবং তা সযত্নে রক্ষা করতে চান।

স্বদেশে ভাল ঘরের মেয়ে ছিলেন; বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন। প্রথম স্বামীর সঙ্গে হঠাৎ লণ্ডনে একদিন ভাব হয়, তারপর প্রেম ও বিবাহ। নিজের বাপ-মায়ের একটুও মত ছিল না, কিন্তু তাঁদের অমত তিনি গ্রাহ্য করেন নি। ভারতবর্ষে এসেছিলেন উনিশ শো পঁচিশ সালে এবং এসেই লাহোরে জাঁকিয়ে বসেছিলেন। মেম সাহেব বিয়ে ক'রে সমাজে স্বামীর অনায়াসে পদোন্নতি হল; ব্যবসা বাড়তে লাগল; ধনসম্পদ বাড়লো; বাড়লো মার্গারেটের সুখ্যাতি, সুনাম। লাহোরের মত অমন "গে" সহরেও গ্রোভার বাড়ির পার্টির আলাদা খ্যাতি ছিল; হস্টেস হিসেবে মিসেস গ্রোভারের যশ ছড়িয়ে পড়েছিল। ভাল হস্টেস্ হলে সুভাষিণী হ'তে হয়; সব বিষয়ে, সব পরিবেশে তাঁকে আলোচনায় যোগ দিতে হয় সব রকম মানুষের সঙ্গে। তাই যত্ন করে তিনি সবকিছুর অল্পবিদ্যায় পারদর্শিনী হয়েছিলেন। সাহিত্য তাঁর নিজের বিষয়, পড়াশোনায় বেশ ভালই; এদেশে এসে একদিকে যেমন কলা ও সাংস্কৃতিবিদ হলেন, অন্যদিকে তেমনি ভারতীয় আচার-বিচার, রীতি-নীতি, এমনকি সংস্কৃতি সভ্যতাতেও ব্যুৎপন্ন। তাঁর তথ্য দখলে ইংরেজ ও ভারতীয় অতিথিরা অবাক হতেন। ইংরেজ হলেও ভারতের স্বরাজ-আকাঙ্খায় তাঁর উচিত-মাপের সহানুভূতি ছিল, যদিও আন্দোলন তিনি সমর্থন করতেন না, গান্ধীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, উপযুক্ত সময়ে ইংরেজ নিজেই উদারতার সঙ্গে ভারতের ন্যায্য কামনা পূর্ণ করবে, এ বিশ্বাস দৃঢ়ভাবে পোষণ করতেন।

এককথায়, মিসেস মার্গারেট গ্রোভার পরম স্বাচ্ছন্দ্যে ও বেশ সুখে ছিলেন।

তাহ'লে কেন ভগবান কাপুর তাঁর জীবনে তুফান আনল?

একদিন এ প্রশ্ন করেছিলাম মিসেস কাপুরকে।

"আমি নিজেই এ প্রশ্ন বার বার করেছি," উত্তরে বলেছিলেন

মিসেস মার্গারেট কাপুর। "ঠিক কোনও জবাব পাইনি। বোধকরি এই ছিল আমার ভাগ্যের নির্দেশ।"

"ভাগ্য মানেন আপনি?"

"বা রে, মানব না? ভুলে যাবেন না আমি পুরোদস্তুর ভারতীয়।"

"হয়তো আপনার প্রথম স্বামীকে আপনি কোনও দিন সত্যিকার ভালবাসেননি।"

"তা হবে। অন্তত, সে ভালবাসার চেয়েও বড় ভালবাসা আমার অন্তর ভ'রে দিয়েছিল।"

"তা কি সম্ভব?"

"নিশ্চয় সম্ভব। কোন প্রেম দীর্ঘস্থায়ী; কোন প্রেম ক্ষণস্থায়ী। একটাও মিথ্যে নয়। একটা অন্যটার চেয়ে হীনও নয়।"

"কিন্তু বিবাহিত প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হওয়াই উচিত নয়কি?"

"হলে ভাল। না হলেও ক্ষতি নেই। শুধু ভালবাসা ফুরলে বিয়ের নটে শাকটিও মুড়িয়ে ফেলতে হয়।"

"এখানেই তো আমার আপত্তি।"

"আপত্তি, যেহেতু সংস্কার আপনাকে বেঁধে রেখেছে।"

আমি একথার জবাব দিলাম না। তিনি বললেন ঃ

"আমি পরে অনেকবার ভেবেছি মিঃ কাপুরের কী ছিল যা আমাকে এমন ক'রে ভাসিয়ে নিয়ে গেল! আমার প্রথম স্বামীর প্রাচুর্য ছিল না, একমাত্র অর্থের ছাড়া; প্রখর দীপ্তি ছিল না। এ দুটোই ছিল আমার দ্বিতীয় স্বামীর, অফুরন্ত। তাঁর ব্যক্তিত্বে ম্যাজিক ছিল। তিনি ছিলেন প্রাণের বন্যা, সে বন্যাই আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেল।"

"বেশতো। ভাসবার ক্ষমতাই বা ক'জনের থাকে?"

"ক্ষমতা?" বড় বড় চোখে বিস্ময় ফুটে উঠল। "তাকে ক্ষমতা বলছেন! বড় সর্বনেশে ক্ষমতা সে। কী ব্যথা, কী জ্বালা, কী ব্যাকুল, দুঃসহ, দুর্বার দহন তা বোধহয় আপনি জানেন না।"

"অনুমান করতে পারি।"

"অনুমানের জিনিষ তা নয়। পরে আমি অনুশোচনা করেছি, কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না।"

"অনুশোচনা কেন?"

"দেখুন, মিঃ কোনার, স্বামী নির্বাচন বড় কঠিন কাজ। ভালোবাসা চাই, তার সংগে আরও কয়েকটা গুণ।"

"যেমন?"

"যেমন বিশ্বাস, সহানুভূতি, নির্ভরশীলতা। যেমন বিত্ত, সংযম, প্রশান্তি।"

"এ যে আনন্দবাজার পত্রিকায় পাত্রী-চাই বিজ্ঞাপন।"

"আগুন, বন্যা, এসব শুনতে ভাল। এদের আকর্ষণ দুর্দমনীয়। কিন্তু ভালোবাসায় ভেসে গিয়ে যে বিয়ে তার পরিণতি শুভ নয়।"

"আপনার তো শুভই হ'য়েছিল।"

"প্রথম প্রথম। সে যে কী অপূর্ব নিবিড় আনন্দ, তা বলে বোঝান যায় না। নিজেকে যে অমন ক'রে নিঃশেষে হারানো যায়, তা কি আমি জানতাম। কিন্তু, হায়, সে হারানো তো চিরস্থায়ী নয়। মিঃ কাপুরের প্রাণ-প্রাচুর্য ছিল, বিত্ত-প্রাচুর্য ছিল না। রোজগার কম, ব্যয় বেশি। ধার দেনা, অশান্তি। বাধ্য হয়ে অনেক আকাঙ্ক্ষার অপূর্ণতা। সে সবও কিছু নয়। কিন্তু একদিন দেখতে পেলাম অমন প্রাণবন্ত মানুষটা আমাকে আর পুরো বিশ্বাস করেন না। দস্তুরমত সন্দেহ করেন।"

"বলেন কী!"

"একথা আর কাউকে বলিনি এর আগে। আমি পার্টি ছাড়লাম, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে বেড়ান ছাড়লাম, কিন্তু সন্দেহ তাঁর কমল না। বেড়েই চলল। শেষের দিকে সেটা দস্তুরমত কুৎসিৎ হ'য়ে উঠল।"

"হয়তো ভাবলেন একদিন আপনি তাঁকেও ত্যাগ করতে পারেন।"

"আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। সত্যিই তাই। পাঁচ বছর

আমি কী-যে একাকী জীবন কাটিয়েছি, তা ভাবতে পারেন না আপনি। তারপর হ'ল সেই নিদারুণ দুর্ঘটনা। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। আমি যেন কেমন দিশাহারা হলাম। একবার মনে হল, মুক্তি! পরক্ষণেই বুঝলাম, মুক্তি কোথায়? অন্ধকার হ'তে অন্ধকারে?"

"তিনি কি বিশেষ কিছু রেখে যাননি আপনার জন্যে?"

"প্রথম তাই ভয় হয়েছিল। কিন্তু পরে জানলাম তা নয়। আমার নামে অনেক টাকার একটা বামা তিনি করেছিলেন। আমাকেও জানতে দেননি! শত অভাবেও তার প্রিমিয়ম ঠিক দিয়ে গেছেন।"

"ভালবাসতেন আপনাকে।"

"বড় বেশি।"

আরও বছর খানেক পরের কথা। এর মধ্যে মার্গারেট কাপুরের বেশ বয়স কমেছে।

হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকে চেয়ার দখল ক'রে মিসেস কাপুর বললেন, "কালকে আপনার সম্পাদকীয়টা খুব ভাল হয়েছিল।"

"ধন্যবাদ। তারপর, খবর কী?"

"কিসের?"

"কেন? আপনার?"

"আমি কী মন্ত্রী যে সর্বদাই আমি খবর হ'য়ে থাকব?"

"মন্ত্রীরাই বুঝি খবর? আপনি তো একটি জীবন্ত দৈনিক!"

"একটা প্রশ্ন করবার আছে আপনাকে।"

"অনায়াসে, এক্ষুনি।"

"সবচেয়ে বেশি সুদে কোথায় টাকা রাখা যায় বলুন।"

"কেন? আমার কাছে। যত সুদ চান, পাবেন। শুধু আসল না চাইলেই হল।"

"আপনার মধ্যে যে আসল কিছু নেই, তা কি আমি জানিনে! তামাসা রাখুন। কথার উত্তর দিন।"

"দেখুন, মাদাম, আমি জীবনে এক পয়সা কোথাও ইনভেস্ট করিনি, আমাতে ও আমার পরিবারে ছাড়া। ব্যাংক থেকে প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়মিত লাল কালি-চিহ্নিত হিসেব আসে, আমি দার্শনিক অনীহার সঙ্গে সেটা বাজে কাগজের বাস্কেটে নিক্ষেপ করি।"

"উত্তম কথা। তাহ'লে আপনিই আমাকে নিঃস্বার্থ পরামর্শ দিতে পারবেন।"

"আপনি যখন নাছোড়বান্দা, তখন ভেবে দেখি। ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট শুনেছি বেশ মজবুত ও লাভজনক জিনিষ। চোখে দেখিনি। সুদও পাবেন ভাল, দেশের কাজও হবে।"

"আর মারা যাবার ভয়ও নেই।"

"অন্তত আমরা মরবার আগে নয়। কিন্তু হঠাৎ এমন সুদলোভী হ'য়ে উঠলেন কেন?"

"কারণ আছে। কালই একটা কুকাজ করে ফেলেছি।"

"যথা?"

"একজনকে অনেকগুলো টাকা দিয়েছি।"

"ধার?"

"ধারই বলতে হবে।"

"আহা, আমি যদি টের পেতাম! কত সুদ পাবেন।"

"সুদ টুদ নেই।"

"বলেন কি? এ যে অবিশ্বাস্য! কত টাকা?"

"পঁচিশ হাজার।"

একটু থেমে বললাম, "আপনার ভূতপূর্ব স্বামী মিঃ গ্রোভার কে?"

আকাশ থেকে পড়লেন মিসেস কাপুর।

"মাই গড্। আপনি নিশ্চয় ম্যাজিক জানেন! বুঝলেন কি করে?"

"বুদ্ধি দিয়ে। অত টাকা কোন ব্যবসায়ী ছাড়া নেয় না। তিনি

ছাড়া কোন ব্যবসায়ীর সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে ব'লে জানি না। যাকে খুব ভাল ক'রে না জানেন তাকে এতগুলি টাকা আপনি দেবেন না।"

"আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। তাকেই দিয়েছি। বেচারা বড় দুর্দিনে পড়েছে। আমাদের বিবাহ বিচ্ছেদের পর থেকে একটু একটু ক'রে ভেঙ্গে পড়েছে। সংসারে মন নেই। বড় অসুখী। তা ছাড়া, ওর প্রতি একদিন বড় অন্যায় করেছিলাম, বড় আঘাত দিয়েছিলাম। মনটা অপরাধী ছিল। মনে হল, ওর বিপদে যদি কিছু সাহায্য করতে পারি, অপরাধ ভাবটা কেটে যাবে।"

"খুব ভাল কাজ করেছেন। টাকাটা ফেরৎ পাবেন?'

"যদি কোনও মতে পারে টাকা সে দেবেই।"

"কিন্তু পারবে কী?"

"ঈশ্বর জানেন।"

"দিয়ে এখন অনুশোচনা হচ্চে?"

"ঠিক তা নয়। কিন্তু বুঝতে পারছি বাকি টাকাটা খোলা থাকলে একদিন খালি হ'য়ে যাবে। তাই কিছুতে আটকে রাখতে চাই।"

"এক কাজ করুন। একটা বাড়ি কিনুন, বা তৈরি করুন। দিল্লিতে বাড়ির বড়ো বিত্ত নেই। দশ বছরে টাকা ফেরৎ আসবে। তারপর সবটাই লাভ।"

"কেউ কেউ অবশ্য একথা আগেও বলেছেন, আমিও একেবারে ভাবিনি তা নয়। কিন্তু রিয়েল এস্টেট বড় ঝামেলার ব্যাপার নয়কি?"

"ঝামেলা তো আছেই, জীবনটাই ঝামেলা। তাইতো বেঁচে সুখ, আনন্দ। বাড়ি একটা আপনার হওয়া দরকার।"

"কেন?"

"তাহলে আবার ঘরকন্নায় মন বসবে।"

"আবার?"

"কেন নয় শুনি? আপনি মোটেই ফুরিয়ে যাননি। জীবনের প্রাচুর্য এখনও আপনার রয়েছে।"

"ধন্যবাদ। আপনি বড্ড মন-খুশি কথা বলতে পারেন। কিন্তু বয়েস তো কম হল না।"

"কত হল?"

"কী অভদ্র আপনি। কোনও মহিলাকে বয়েস জিজ্ঞেস করতে আছে? আর করলেই কি সত্যিকার বয়েস কেউ বলে?"

"মিথ্যে ক'রেই বলুন না।"

"যদি বলি বত্রিশ?"

"আমিও নেপোলিয়নের মত বলবো, আইডিয়াল এজ।"

"হায়, হায়, বত্রিশ এ জীবনে আর দেখবো না।"

"বিয়াল্লিশ দেখবেন তো? তাহলেই হল।"

"এবার কিন্তু রাগ করবো। মোটেই আমার বিয়াল্লিশ হয়নি।"

"সুসমাচার। তবে সংশয় কিসের?"

"উপযুক্ত একটি বৃদ্ধের অভাব।"

"চল্লিশে তো জীবন শুরু!"

"ওটা শেষের আগের শুরু। দেখেন না, সলতে নিববার আগে কেমন দপ দপ ক'রে জ্বলে।"

সাড়ী পরলে মিসেস মার্গারেট কাপুরকে কেমন যেন একটু বেখাপ্পা লাগে, কিন্তু সাড়ী ওঁর মাঝে মাঝে পড়া চাই। কেননা মার্গারেট কাপুর ভারতীয়।

সেদিন ফিকে নীল রংএর শিফন-সাড়ী পরেছেন মার্গারেট কাপুর, কানে ছুটি ঝিলিক-মারা মুক্তো, গলায় মুক্তোর মালা, হাতে মুক্তো-বসান ছুগাছি কঙ্কণ।

এসে চেয়ার চেপে বসলেন।

"এটা তাড়াতাড়ি দেখে দিন।"

"তিনি এলেন, তিনি বসলেন, তিনি জয় করলেন" রচনাটির দিকে চোখ রেখে আমি বললাম।

"আপনাকে কথা বলার জন্য পদ্মশ্রী দেওয়া উচিত।"

"হোল্ড ইয়র টঙ্গ্ এ্যাণ্ড লেট মি—সী দিস্।"

হেসে গড়িয়ে পড়লেন মিসেস কাপুর।

রচনাটা ফিরিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলাম, "এতো তাড়া কিসের ?"

"আপনার কী মনে হয় ?"

"দেবাঃ ন জানন্তি।"

"ওটা কী ভাষা হল ? হিন্দী তো নয়।"

"দেবভাষা সংস্কৃত।"

"তবে মানুষের মুখে কেন ?"

"আমাদের শাস্ত্রকাররা বলেছেন, ধ্বনির উৎপত্তি ঐশ্বরিক। আপনারাও তাই বলেন ঃ এ্যাট ফার্ষ্ট ওয়াজ দ' ওয়ার্ড।"

"আপনার ধ্বনি কিন্তু একেবারেই দেবসুলভ নয়। বরং একটি বহুদৃষ্ট চতুষ্পদের কণ্ঠস্বর মনে করিয়ে দেয়।"

"শুনতে জানলে সবই সুরধনী। ভালবাসলে হিড়িম্বাও সুদর্শনা।"

"হিড়িম্বা কে ?"

"মহাভারত পড়েননি ? হিড়িম্বা ভীমপ্রেয়সী রাক্ষস কুলশোভিনী। মহাভারত না পড়ে ভারতকে জানলেন কি করে ?"

"মহা-টুকু বাদ দিয়ে। যা ক'রে আপনাকে জানলাম।"

"মহা-টুকুই আমার বেলা বাদ পড়েনি। আহা-টুকুও বাদ গেছে।"

"তাই বুঝি এমন হাহাকার করছেন ?"

"নিজের হাহাকার চেপে আপনাকে দেখে বাহা বাহা করছি।"

"সত্যি আপনার জন্যে দুঃখ হয়। এ বাজারে আপনি একেবারে অচল।"

"তা হোক। আপনি যে খুব সচলা হয়ে উঠেছেন তাতেই আমার আনন্দ।"

"কী যেন একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত করছেন মনে হচ্চে।"

"ভুল। আপনাকে দেখে সেই বহুদৃষ্ট চতুষ্পদ-কণ্ঠে সঙ্গীত বেজে উঠছে।"

"ধন্যবাদ। সাড়িটা ভালই, কি বলেন?"

"চমৎকার। বিজ্ঞাপনের ভাষায়ঃ সী স্টপস দ' ট্র্যাফিক অন দ' রোড।"

"চাটুকারিতায় আপনি চতুর তা সবাই জানে।"

"কেন নয়? ওটাই দিল্লির বাজারে সবচেয়ে চালু মুদ্রা। কাগজে পড়েননি, কেন্দ্রীয় মহাধিকরণের দুই অট্টালিকার মাঝখানে অফুরন্ত এক তৈল-খনি আবিষ্কৃত হয়েছে? দপ্তরে ঢোকার আগে সবাই এক বাটি তেল সঙ্গে নিয়ে নেয়। পাইপ লাইনে সে তেল মহানগরীর সর্বত্র প্রবাহিত।"

হাসতে হাসতে উঠে পড়লেন মিসেস মর্গারেট কাপুর।

"চলি।"

"কোথায়? কার সঙ্গে?"

"তা আপনার জেনে কাজ নেই।"

"পেট মোটা। মাথায় প্রশস্ত টাক। কানের পিঠে বড় বড় গুচ্ছ গুচ্ছ চুল। কাঁচাপাকা গম্ভীর গোঁফ। কথা বলতে বলতে পুরু ঠোঁট জিভ দিয়ে চাটেন। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা। ডান গালের ওপরের দিকে—ঠিক এইখানটায়—মস্ত একটা তিল; তার মাঝে তিনটি পাকা চুল। চোখ দুটো লালে-সাদায় ঘোলাটে। এই হল মোটামুটি চেহারার বর্ণনা।"

হাসতে হাসতে বললেন মিসেস কাপুর।

"কন্দর্পকান্তি।" আমি 'রায়' দিলাম।

"প্রস্তাবটি সহজ ও সরল। অস্ট্রেলিয়ায় বিরাট আবাদী জমির মালিক। পঁচিশটি ঘোড়া, ডজনখানেক দুগ্ধবতী গাভী, মাঝারি গোছের পোলট্রি, বিত্তের এই সংক্ষিপ্ত বিবরণ। সুন্দর দোতলা বাড়ি, ফুলে-সবুজে সুসজ্জিত। একমাত্র পত্নী পাঁচ বছর আগে বিগত হয়েছেন। একটি মেয়ে, অনেকদিন বিয়ে হ'য়ে গেছে। সুতরাং, মনে করতে পারো, আমি নিঃসন্তান।"

"এ পর্যন্ত ঘটনার বিন্যাস আশাপ্রদ।"

"আমি বসে আছি সোফায়। উনি বেশ দূরে দেয়াল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে। হঠাৎ দেয়ালের দিকে মুখ ক'রে হাঁটু গেড়ে বসে পড়লেন। তারপর একটানা নিঃশ্বাসে বলে গেলেনঃ 'আমার বয়স হ'লেও দেহমন সুস্থ, গায়ের জোর ভীষণ। অর্থের অভাব নেই। তুমি যে আরাম চাইবে, তাই পাবে। অস্ট্রেলিয়া বড় সুন্দর দেশ। বছরে একবার আমরা টোকিয়ো বা বালিতে বেড়াতে যাবো। চাওতো য়ুরোপেও যেতে পারবো। কোনরকম সুখ দিতে আমি কার্পণ্য করবো না।"

"সুবক্তা। তা আপনি কি উত্তর দিলেন?"

"তিনটি দেব-ধ্বনিতে যবনিকা টেনে দিলামঃ ডোণ্ট বি সীলি।"

"অগ্নিশিখা নিবল?"

"অগ্নিশিখা? ভেজা কাঠে আগুন জ্বলে? দুগ্ধবতী গাভীও তেজোবান ঘোড়ার সঙ্গে সহবাস করতে করতে বেচারা—"

"কোনও বহুদৃষ্ট চতুষ্পদে পরিণত হয়েছে? এইতো বলতে চান? সমস্ত পুরুষ জাতির হয়ে আমি কঠিন প্রতিবাদ করছি।"

"প্রতিবাদ অগ্রাহ্য। বাদ-বিবাদ যেখানে নেই সেখানে প্রতিবাদ কোথায়?"

"সে যাক। বুঝলাম, আপনার মন ভ'রেনি। তথাপি অবস্থা আশাপ্রদ।"

"কিসে ?"

"প্রস্তাবটা আপনি যে শুনেছেন, বিবেচনা ক'রে প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাতে। বোঝা যাচ্ছে, আপনি ঠিকপথে চলছেন। এপথে একদিন পথহারা একজনের সঙ্গে অবশ্যই দেখা হবে। তাকে আপনি প্রশ্ন করবেন "পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ ?" সে উত্তর দেবে, "ভদ্রে, আপনি ঠিক ধরিয়াছেন।" আপনি বলবেন, "তাহা হইলে এই পথে আইস।"

হাসির তরঙ্গে দুলে দুলে উঠলেন মিসেস কাপুর।

"অমন পথ-হারা অনেকেই এসে 'কিউ' করে দাঁড়ায়। আপনি জানেন না, এদেশে একাকী রমণীর জীবনযাত্রা কী ভয়ানক কঠিন। সবাই ভাবে, একটু সরে বসলেই হল। ডাকলেই ছুটে আসবে। কী কুৎসিৎ কৌতূহল! প্রশ্নে প্রশ্নে উত্তক্ত হতে হয়। বিদেশী হয়ে বিপদ আরও। বিদেশী বিধবা নারী যেন প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গে বিছানায় শুতে সর্বদা উৎসুক হ'য়ে আছে। তাকে ডাকলেই সে সিনেমায় যাবে, হোটেলে খাবে, মদ্যপান করবে এবং তার জন্যে খরচের বিনিময়ে, বিছানায় শোবে। এমন চরিত্রহীন সহর আমি আর কোথাও দেখিনি।"

"এসব আপনি কাদের কথা বলছেন ?" আমি রীতিমত অবাক হলাম।

"আপনাদের। নাম নাই বা শুনলেন। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন, যাঁদের খ্যাতি দেশজোড়া, যাঁদের নীতিবোধ বাইরে মধ্যাহ্ন সূর্যের মত প্রখর।"

"আশ্বস্ত হলাম।"

"আশ্বস্ত হলেন ?"

"হব না! আপনি যাঁদের কথা বললেন, তাঁরাও যে মানুষ, তা জানতে পেরে আশ্বস্ত হলাম। ধরুন, ঘনশ্যাম আগরওয়ালা। দপ্তরে তাঁর দাপটে সবাই জুজু। ভদ্র কথা, ভদ্র ব্যবহার ও ঘনশ্যাম আগর-

ওয়ালা পরস্পর বিরোধী। যদি আপনি হঠাৎ দেখতে পান, তিনি বৌ-এর ধমক খেয়ে কেঁচো, তাহলে আশ্বস্ত হবেন না?”

“আপনার সবটাতেই মস্করা। কিন্তু আমার সমস্যাটা ভেবে দেখুন। বিলেতে বহু নারী পুরুষ একাকী জীবন-যাপন করে। কেউ তাকিয়েও দেখে না তারা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে। একাকী মানুষের একাকীত্ব সম্মান পায়। এদেশে ঠিক তার উল্টো। একাকী পুরুষের জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে বোন, বৌদি, মাসি-পিসির মনোযোগে। আর একাকিনীর? তাকে বাঁচতেই দেওয়া হয় না, যদি-না সে সংস্কার ও প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ করে। সর্বদা লোভী পুরুষের শাণিত দৃষ্টি তাকে অনুসরণ করবে। এমন সব ইঙ্গিতময় কথা তাকে শুনতে হবে, যা গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়। সে যাই করুক তার বিকৃত, বিস্ফারিত কাহিনী হাওয়ার আগে উড়ে বেড়াবে।”

“খুব সত্যি কথা। ইহা হইতে, হে বালকবালিকাগণ, কী শিখিলে?”

“এদেশের পুরুষগুলি চরিত্রহীন।”

“ভুল হল। এদেশে বিধবা বিদেশী নারীর একাকিনী থাকা উচিত নয়।”

নোকরীর দাবীতে মাস তিনেক অন্যত্র যেতে হয়েছিল। ফিরে আসার প্রথম দিনেই মিসেস মার্গারেট কাপুর এসে চেয়ার চেপে বসলেন।

যেমন হ’য়ে থাকে, কিছুটা বাকচাতুর্য হল। মিসেস কাপুর ঝলমল করছেন। বুদ্ধির প্রাচুর্য আরও বেশি, হাসির উল্লাস আরও বেগময়।

“একটা ব্যক্তিগত পরামর্শ চাই,” একসময়ে সহসা গম্ভীর হ’য়ে বললেন মার্গারেট কাপুর।

“নিশ্চয়, নিশ্চয়। ও জিনিসের অজস্র ষ্টক মজুত আছে।”

"মানে ব্যাপারটা আপনাকে স্থির মনে বুঝতে হবে।"

"আপনি সামনে বসে থাকলে সেটা একটু কঠিন।"

"রসিকতা রাখুন। আমাকে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছতে সাহায্য করুন।"

"আপনি কি অনিশ্চয়তার বিরাট উপত্যকায় বিচরণ করছেন, না, এমন স্থানে উপনীত, যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন সহজ নয়?"

মিসেস কাপুরকে স্পষ্ট বিব্রত দেখতে পেলাম। যা থেমে থেমে, সংকোচ জয় করে, বললেন তার মর্মার্থ সমস্যাংকুল। দুইটি পুরুষের মাঝখানে তিনি সংশয়ে দোল খাচ্ছেন। একজন প্রবীণ, অন্যজন নবীন। একজনের প্রভূত অর্থ, অন্যজন—তাঁর মতে—দরিদ্র। একজন তাঁকে পার্থিব সব সুখ দিতে সক্ষম: বছরে তিন মাস রিভিয়েরায় বিশ্রাম, বিরাট প্রাসাদ, দাসদাসী, সামাজিক গৌরব ও প্রতিষ্ঠা। অন্যজন যে সুখের সন্ধান এনেছে, তা অপার্থিব। এই বয়সে অপার্থিবের চেয়ে পার্থিব সুখটাই বড় করে দেখা উচিত। পাঁচ বছর ধরে চাকরি করতে করতে জীবনে অভাব যে কী ভয়ানক বস্তু, তা তিনি জানতে পেরেছেন। যিনি প্রবীণ, তাঁর দাবি বেশি নয়। সমাজে মেমসাহেব স্ত্রী তাঁর প্রতিষ্ঠা বাড়াবে, তাঁর যৌবনের একটা অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে। তিনি তাঁকে বেশি জ্বালাতন করবেন না, প্রতিজ্ঞা করেছেন, মার্গারেট অনেক সময়ই নিজের ইচ্ছামত চলতে পারবেন। যে নবীন, তার দাবি ষোল আনা। সে মার্গারেটের মধ্যে নতুন পৃথিবী, নতুন আকাশ খুঁজে পেয়েছে। মিসেস মার্গারেট কাপুর এখন কী করেন? এই হল তাঁর সমস্যা।

তিনি থামলেন। মুখখানা আরক্ত। চোখে কখনও বিষাদের আঁধার, কখনও আনন্দের দীপ্তি।

"সমস্যাটা তো দেখছি আপনাকে নিয়ে।"

"কেন?" বিস্ময় বেজে উঠল তাঁর স্বরে।

"নবনকে যে আপনি ভালবাসেন।"

হঠাৎ কোনও কথা বেরুল না তাঁর মুখে। তারপর বললেন :

"আপনি কী করে বুঝলেন ?"

"বোঝা কি খুব কঠিন ?"

"সত্যি আপনার বুদ্ধির প্রশংসা করতে হয়।"

"তা করুন যতো ইচ্ছে। কিন্তু এ ব্যাপারটা তো জলের মত সোজা। একটা স্কুলে-পড়া ছেলেও বুঝতে পারে।"

"কক্ষনো নয়।"

"বুঝিয়ে দিচ্ছি। প্রবীণ ও নবীন তুজনেই আপনাকে চায়। বাস্তব দৃষ্টিতে দেখতে গেলে প্রবীণের কাছে নবীন দাঁড়াতে পারে না। যদি আপনার পরিণত জীবনের বছরগুলি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটানই মুখ্য বিবেচনা হত, তাহলে আপনি চোখ বুজে প্রবীণের হাত ধরে গির্জায় গিয়ে দাঁড়াতেন। ভালোবাসায় নবীন আত্মহত্যার ভয় দেখালেও নিরস্ত হতেন না, তাকে বুঝিয়ে বলতেন, বাছা, বোকামি কোরো না, আমি ক্যানডিডা নই, তুদিনেই তোমার ভুল ভাঙবে, সারা জীবন পস্তাবে, আমারও তুর্ভোগের শেষ থাকবে না। সমস্যার জন্ম হয়েছে আপনার অন্তরে প্রেমের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে। আপনি নবীনকে ভালবেসে ফেলেছেন ; তার প্রেমে পড়েছেন। তাই প্রবীণের হাত-বাড়িয়ে-দেওয়া অত ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা, আরাম আপনাকে জয় করতে পারেনি। তাই আপনার দ্বিধা।"

মিসেস মার্গারেট কাপুরের আত্মরক্ষার আর কোনও অস্ত্র রইল না। তিনি লজ্জারুণ হলেন। চোখ তুটি ছলছল করে উঠল।

"দেখুন, জীবনে চিরদিন আমি ভুল করে এসেছি। একটি ইঞ্জিনীয়র ছেলের সঙ্গে আমার ভাব জমে উঠেছিল ; সে প্রস্তাব করবে-করবে, এমন সময় আমি মিঃ গ্রোভারকে নিয়ে পাগল হলাম। সবার আপত্তি অগ্রাহ্য করে তাঁর স্ত্রী হয়ে এলাম ভারতবর্ষে। বাবা-মা-

ভাই-বোন আত্মীয়স্বজন কারুর মত ছিল না। ভারতবর্ষে বিদেশী মেয়েদের খাপ খাইয়ে নেওয়া যে কী কষ্ট, তা আপনি বুঝবেন না। যখন খাপ খেয়ে গেছি মনে হল, আমার যখন কোনও অভাব নেই, তখন আবার পাগল হলাম। ধনসম্পদ আরাম-ঐশ্বর্য, নিশ্চিন্ত জীবন-যাত্রার নিরুপদ্রব আবহাওয়া, সব ত্যাগ করে বিয়ে করলাম মিঃ কাপুরকে। তিনি মারা গেলে কী অবস্থায় পড়লাম, তার কিছুটা আপনি জানেন। তারপর কতকষ্টে নিজেকে আবার গুছিয়ে নিলাম। ভেঙ্গে পড়ে কী বেঁচে থাকা যায় ? আমি জানতাম, একাকী বার্ধক্যের ধূসর গোধূলিতে পৌঁছান আমার পক্ষে দুঃসহ। আমার অবলম্বন চাই, আশ্রয় চাই, আরাম, ঐশ্বর্য, প্রতিষ্ঠা চাই। কত লোক, কত বড় বড় লোক, কত প্রলোভনের জাল পাতল, আমি একবারও ধরা পড়লাম না। ধরা দিলেই আমার সবটুকু নিঃশেষ ; এ বয়সে পুঁজি আর কতটুকু বলুন। কত লোক এল বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে, একটাও যথেষ্ট লোভনীয় মনে হল না। অধিকাংশই সেই অস্ট্রেলিয়া নিবাসীর মত। বর্তমানে যে প্রবীণ ভদ্রলোকের কথা বলছি তিনি অন্যজাতের। কয়েক মাস আগে প্রথম তাঁর প্রথম-প্রস্তাব এসেছিল, সবদিক থেকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলাম। লোকটিও মন্দ নয়, তাকে ভালবাসতে না পারলেও একসঙ্গে বাস করার সে যোগ্য। বিশেষ করে বছরের অর্ধেক তার বিদেশে কাটে, সে আমাকে খুব একটা দাবি করবে না। এর মধ্যে দেখুন কোথা থেকে কী হয়ে গেল, আবার আমি পাগল হলাম। আমার বুদ্ধি, বিবেচনা সব ভেসে যেতে বসল। আমি জানি, আবার ভুল করছি, কিন্তু আমার চেয়ে এ ভুলের শক্তি অনেক বেশি, সে আমায় টেনে নিয়ে যাচ্ছে বোধহয় সর্বনাশের দিকে।"

"ভয় পাচ্ছেন কেন ?"

"বয়স তো কম হল না।"

"ওর বয়েস কত ?"

"ওর কোনও বয়েস্ নেই।"

"তাহলে আর ভাবনা কী। এগিয়ে যান।"

"আপনার কাছে পরামর্শের জন্য এসেছিলাম।"

"দরকার কী সত্যিই আছে ? আমি ভালবাসার দলে। জীবনতো যাবেই ; সে ভালবেসে যাক। জয় করে, ক্ষয় করে, সৃষ্টি ও ধ্বংস করে যাক।"

মাস তিনেক পর মুসৌরী থেকে মিসেস মার্গারেট কাপুরের তৃতীয় বিবাহের নিমন্ত্রণ এল। এবার তিনি হলেন মার্গারেট বসু।

একটু আকাশ

জয়দেব ত্রিপাঠির জীবনেও হঠাৎ অঘটন ঘটল।

জয়দেব ত্রিপাঠি সাধারণ মানুষ নন, তিনি মন্ত্রী। সর্বদা অনেক বড় বড় কাজে তাঁর দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত সমাপ্ত; দেশ-সেবার বিরাট বোঝায় অহরহ তিনি নিষ্পিষ্ট। নিজের বলতে তাঁর কিছু নেই, একটি দিবস পর্যন্ত নয়, নয় একটি রজনী। সারাদিন ও রাত্রির অনেকখানি তাঁর জনাকীর্ণ; সমস্যাকীর্ণ; নিদ্রা এবং একান্ত ব্যক্তিগত দুচারটে অপরিহার্য ব্যাপার ছাড়া তিনি কখনো একা নন, কোনও কিছু তাঁর একার নয়।

এর মধ্যেই অঘটনটা ঘটল। গিয়েছিলেন জনসভায়। বিখ্যাত দার্শনিক ডাক্তার সর্বাধিকারীর বক্তৃতা; তিনি সভাপতি। সেখানে, যেমন সর্বদা হ'য়ে থাকে, ফুলের মালায় তাঁরই কণ্ঠ ও বক্ষদেশ অধিকতর সুশোভিত হয়েছিল; দার্শনিককে ম্লান ক'রে তিনিই সভা আলোকিত করেছিলেন। এক কবি তাঁর স্তুতি ক'রে একটি স্বরচিত কবিতা গান করেছিল। প্রধান বক্তার ভাষণ শেষ হলে জনতাকে উদ্দেশ্য করে তিনি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করে ছিলেন, করতালির অভাব দেখে কণ্ঠস্বর চড়িয়ে দেশের শত্রুদের লক্ষ্য করে গরম গরম অনেক কিছু বলে সে অভাব পূর্ণ করেছিলেন, যদিও তাঁর সঙ্গে কোনও দর্শনেরই সামান্য সম্পর্ক পর্যন্ত ছিল না। ভাষণ শেষ হলে বিজয়ী বীরের মত মঞ্চ থেকে নেমে, গুণ ও ক্ষমতা মুগ্ধ অনুচরদের মুখে বক্তৃতার তারিফ শুনতে শুনতে, জয়দেব ত্রিপাঠি জাতীয় পতাকা-শোভিত গাড়ীর দিকে শান্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাচ্ছিলেন।

এ পর্যন্ত সবকিছু ঠিক চলছিল, মন্ত্রীর সবকিছু যেমন চলে থাকে।

এমন সময় হঠাৎ জয়দেব ত্রিপাঠির দৃষ্টি একটি মানুষের দিকে আকৃষ্ট

হল। মুখটা, অত ভিড়েও, বড় চেনা চেনা। ছিপছিপে লম্বা মানুষটি, বয়স ষাটের কাছাকাছি। মাথায় প্রশস্ত টাক, রং রোদে-পোড়া তামাটে, চোখে নিকেল-ফ্রেমের চশমা। মন্ত্রী হবার পর থেকে জয়দেব ত্রিপাঠি সাধারণত অপরিচিত মানুষের দিকে তাকাবার সময় পান না; তথাপি এ লোকটি তাঁর দৃষ্টি বার বার আকর্ষণ করল। মনে হল, একে যেন খুব ভাল করে জানেন, চেনেন, অন্তত, জানতেন, চিনতেন। কিন্তু দেশের ও দশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সমস্যায় সমাকীর্ণ মনে পুরাতন স্মৃতি দানা বাঁধল না। মন্থর গতিকে তিনি মন্থরতর করলেন। একটু যেন অপেক্ষা করলেন, লোকটির তরফ থেকে কোনও পরিচয়ের নিশানার। পরক্ষণেই মনে হল এগিয়ে এসে আলাপ করবে এমন হিম্মৎ লোকটার থাকা স্বাভাবিক নয়।

এবার দেখলেন, লোকটির সঙ্গে একটি সুদর্শন যুবক। কুড়ি বাইশ বছর বয়স হবে; বুদ্ধি-দীপ্ত, গৌর বর্ণ, উজ্জ্বল-স্বাস্থ্য ছেলে। মাথায় সুবিন্যস্ত কালো চুল, ধবধবে সার্ট আর পায়জামা পরণে। বড় ভাল লাগিল ছেলেটির মুখখানা। বার কয়েক তাকিয়ে দেখলেন জয়দেব ত্রিপাঠি।

চারপাশের অনুরক্ত মানুষদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে এগিয়ে চললেন। নজর রাখলেন, নিজের অজ্ঞাতে, রহস্যময় লোকটি ও ছেলেটির ওপর। ওরাও এগিয়ে চলেছে, কিছুটা দূরে, সভা-স্থান থেকে রাস্তার দিকে। মন্ত্রী হবার পর জয়দেব ত্রিপাঠি বলেন বেশি, শোনবার অবসর পান কম। আজ পাশের লোকেরাই বলে চলল বেশি, তিনি দুচারটে মামুলী কথায় জবাব দিয়ে গেলেন।

একবার চলতে চলতে সেই লোকটি তাঁর বড় কাছে এসে গেল। জয়দেব ত্রিপাঠি খুব ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখলেন। রহস্যের সমাধান হল না। শুধু বাপ ও ছেলের (ওরা যে বাপ ও ছেলে চেহারার খুব একটা মিল না থাকলেও ত্রিপাঠি বুঝতে পেরেছিলেন) টুকরো কথাবার্তা কানে ভেসে এল।

"পিতাজি, ইনিই তো জয়দেব ত্রিপাঠি ?"

"হ্যাঁ, বেটা।"

"কী বক্তৃতাটাই না করলেন উনি।"

"মন্ত্রীরা অমন বক্তৃতাই করে থাকেন।"

"তুমি তো ওঁকে চেন বাবা !"

"ওঁকে তো সবাই চেনে।"

"আমি তা বলছি না—"

"কিছু তোমাকে বলতে হবে না। এবার এগিয়ে চল।"

কথাগুলি পরিষ্কার জয়দেব ত্রিপাঠির কানে ঢুকল। বড় রাগ হল তাঁর। কিন্তু রাগটা থাকল না। দার্শনিকের বক্তৃতা-সভায় সভাপতিত্ব করতে এসে তিনি রাজনীতি করেছেন। ছেলেটার ভাল লাগে নি। হয়তো বামপন্থী প্রভাবে পড়েছে। আরও দুচারবার নজর করে তিনি ছেলেটিকে দেখলেন। রাগ হল না তাঁর মনে। তিনি জয়দেব ত্রিপাঠি, শুধু মানুষ নন, মন্ত্রী। সাধারণ মানুষের চেয়ে তাঁর স্থান অনেক উঁচু। এ দূরত্বটা যেমন উপভোগ্য, তেমনি প্রয়োজনীয়। সাধারণ মানুষ কি বলে তার কোনও দাম নেই, কিন্তু দাম আছে যাকে ভোট দেয় তার। জয়দেব ত্রিপাঠির বক্তৃতা পছন্দ না হয় নাই হল, নির্বাচনে তিনি অনেক ভোট পেয়ে থাকেন। গতি বাড়িয়ে দিলেন ত্রিপাঠি। নজর পড়ল মনিবন্ধে ঘড়িতে। আটটা। আটটায় জরুরী আলোচনা আছে কয়েকজন লোকের সঙ্গে। তারা নিশ্চয় এসে ব'সে আছে। ব'সে থাকা ভাল। ভাল বসিয়ে রাখা। ঠিক সময়মত কোনও কাজ করতে নেই। তাতে নেতৃত্ব বজায় থাকে না। যে-সভায় তিনি বক্তৃতা করলেন, সেখানে আসবার কথা ছিল সাড়ে ছ'টায় ; এসেছেন সোওয়া-সাতটায়। পঁয়তাল্লিশ মিনিট অপেক্ষা ক'রে জনতার আগ্রহ যখন বেড়ে শিখরে উঠেছে, তখন। বসিয়ে না রেখে, অপেক্ষা না করিয়ে দর্শন দেয় তারা, যারা দর্শন দিতে উন্মুখ।

অনেক রাত্রে সেদিনকার মতো দেশসেবা স্থগিত রেখে সামান্য

মৌজ-মেজাজে জয়দেব ত্রিপাঠি যখন শোবার ঘরে এলেন, দেখলেন তাঁর স্ত্রী এককোণে ব'সে তুলসীদাসের রামায়ণ মৃদু সুরে পাঠ করছেন। জয়দেব ত্রিপাঠির জীবনে একটা মাত্র প্রকাশ্য আফসোস: পত্নীকে তিনি মন্ত্রীজায়া করতে পারেন নি। মহামায়া ত্রিপাঠি সেই পুরাতনেই রয়ে গেছেন।

জয়দেব ত্রিপাঠি বর্তমানে যে বিরাট বাংলো বাড়ীতে বাস করেন, যেখানে প্রতিদিন শতাধিক লোকের যাতায়াত, যে বাড়ীর মাথায় জাতীয় পতাকা বাতাসের সঙ্গে উল্লাসে নাচে, যেখানে অন্তত কুড়ি পঁচিশ জন দাস-দাসী, মালী, ড্রাইভার ও স্বামীর ব্যক্তিগত কর্মচারী, মহামায়া ত্রিপাঠি যেন সে বাড়ীর বাসিন্দা নন; তাঁর স্থান অন্য কোন খানে। তিনি থাকেন তাঁর পূজা-অর্চনা, ব্রত-উপবাস নিয়ে আলাদা; সে ব্যবধান জয়দেব ত্রিপাঠি লঙ্ঘন করতে পারেন না। সংসারের সঙ্গে মহামায়ার যেটুকু সম্পর্ক তা কেবল স্বামীর সেবা। এ কাজটা তিনি করতে চান, করতে পারেন না। স্বামীকে সেই কোন অতীতে (বড় বেশী দূর মনে হয় সে-দিনগুলিকে আজ) একদিন দেশ-সেবার বন্ধুর পথে পরম গর্বে ও গভীর শ্রদ্ধায় বার করে দিয়েছিলেন; মনে হয়েছিল জয়দেব সাধারণ মানুষ নন, দেবতার আলোয় উজ্জ্বল; মনে হয়েছিল মহামায়া সমস্তিপুরের পোষ্ট মাষ্টারের মেয়ে নন, বীরজায়া রাজপুত রমণী। আজও তাঁর স্বামী দিনরাত দেশসেবা করেন, কিন্তু মহামায়ার মনে আজ গৌরব নেই; তিনি বিচ্ছিন্ন, নিজের ভিন্ন কোণে সংক্ষিপ্ত। স্বামীকে যতটুকু পান সেবা করেন; কিন্তু বিশেষ একটা পান না। জয়দেব ত্রিপাঠি মহামায়াকে মন্ত্রীজায়া করতে চেয়েছিলেন, তিনি রাজী হন নি। রাজী হন নি সভায় গিয়ে মালা গলায় নিতে, মেয়েদের বৈঠকে বক্তৃতা করতে, বস্তীতে প্রাইমারী স্কুল উদ্বোধন করতে। রোজ রাত্রে স্বামীর শুতে-আসার অপেক্ষা করেন মহামায়া, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে ঠাকুর ঘরের এক পাশে তাঁর নির্দিষ্ট শয্যায় ফিরে যান।

সেদিন অনেক রাত্রে শুতে এলেন জয়দেব ত্রিপাঠি। মেজাজটা বেশ খুশবাই। খবর পেয়েছেন প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাচনে তাঁর প্রতিপক্ষ শুধু পরাস্ত নয়, লাঞ্ছিত হয়েছে। খবরের প্রতীক্ষায় বসেছিলেন ব্যাকুলতা গোপন ক'রে; খবর পাবার পর অনুরক্তদের আপ্যায়ন করে নিজেও একটু মৌজ-মেজাজ হ'য়ে পড়েছিলেন। ঘরে এসে দেখলেন মহামায়া রামায়ণ পাঠ করছেন। ভরত রাজ্য পেয়েও রাজা হ'তে চাইছেন না, রামচন্দ্রকে বলছেন, তুমিই রাজা, আমি কেবল তোমার সেবক। তুমি আমাদের কর্তা, আমরা তোমার ভৃত্য, তুমি আমাদের শাসন কর, তাতে সকলেই আনন্দিত হবে। জয়দেব ত্রিপাঠির কেমন মজা লাগল। চুপ করে দাঁড়িয়ে একটু শুনলেন। ভরত রাজ্য নেবেন না, রামও অযোধ্যায় ফিরবেন না। অবশেষে ভরত রামের আজ্ঞা মেনে নিলেন। 'আর্য, তোমার হেমভূষিত পাদুকাদ্বয় দাও, তারাই রাজ্যের যোগক্ষেম বিধান করবে। আমি জটাচীরধারী ফলমূলাশী হ'য়ে তোমার প্রতীক্ষায় চৌদ্দ বৎসর নগরের বাইরে বাস করব।' জয়দেব ত্রিপাঠি হাসলেন। জটাচীরধারী হ'য়ে রাজকার্য করার দিন বিগত হয়েছে। সে রামও নেই, নেই সে অযোধ্যা। কোথায় সে ভরত?

পুঁথি বন্ধ ক'রে মহামায়া উঠলেন। ঘরের এক কোণে টেবিলের ওপর মিছরী ও লেবুর সরবত ছিল, স্বামীর হাতে তুলে দিলেন। নীচু হ'য়ে বসে জুতো খুললেন।

"সুখবর আছে," বললেন জয়দেব।

মহামায়া নীরবে তাকালেন তাঁর মুখে।

"কংগ্রেস নির্বাচনে আমাদের জিৎ হয়েছে।"

মহামায়া একটু হাসলেন। খুশির, আনন্দের হাসি তা' নয়। তার মানে, এতে আর আশ্চর্য কী? এ-যে হবেই তা আমি জানতাম।

"এবার দেখে নেব মোহনলালকে। অনেক সহ্য করেছি। আর

নয়। এবার সত্যিই ভাবিয়ে তুলেছিল আমায়। কৌটিল্য বলে গেছেন, শত্রুর শেষ রাখতে নেই। এবার ওকে নিঃশেষ করবো। রাজনীতি আর করতে হবে না কংগ্রেসে থেকে।"

স্বামীর মুখে ভয়ানক কাঠিন্য দেখতে পেলেন মহামায়া। চোখ দুটো ক্রোধে জ্বলছে ; ওষ্ঠাধরে হিংসা ফুটে উঠেছে। মনে পড়ল অনেক দিন আগের জয়দেবকে। অনেক মোলায়েম ছিল তাঁর স্বভাব। একবার এক দারোগার হাতে প্রচণ্ড মার খেয়েছিলেন জয়দেব। কিন্তু এমন ক্ষমাশীল ছিল তাঁর মন যে এতটুকু প্রতিহিংসার ইচ্ছা জাগে নি। বরং সেদিন মহামায়াই রেগেছিলেন ; বলেছিলেন, 'এমন দিন চিরকাল থাকবে না ; আমাদের হাতে ক্ষমতা এলে বদ্রীপ্রসাদকে দেখে নিতে হবে।' আর, জয়দেব সেদিন কী জবাব দিয়েছিলেন ? বলেছিলেন, "ওর দোষ নেই। ওর কর্তব্য ও করছে, আমাদের কর্তব্য আমরা। যে কর্তব্য মহত্তর, তার জয় অনিবার্য। আমরা প্রতিশোধ নেবার জন্য স্বাধীনতা চাই নে, চাই মানুষের মত বাঁচবার জন্যে।"

শু'তে শু'তে জয়দেব ত্রিপাঠি বলে চললেন, "এমন জাল এবার পেতেছি, ধরা না প'ড়ে মোহনলালের আর উপায় নেই। তারপর, অন্ততঃ পাঁচ বছরের জন্য কংগ্রেসের কোন নির্বাচিত পদে স্থান যাতে সে না পায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

মৃদু স্বরে মহামায়া বললেন, "বহুদিন তোমরা একসঙ্গে কাজ করেছ, কত বন্ধুত্ব ছিল তোমাদের। আজ এত ঝগড়া........."

"সে অন্যদিন ছিল, মহামায়া। আজ আর একদিন। সেদিন ছিল বিদেশীকে তাড়িয়ে ক্ষমতা পাওয়ার লড়াই। আজ ক্ষমতা রাখবার লড়াই।"

"মোহনলালজি বছরের পর বছর আমাদের বাড়ীরই একজন ছিলেন। দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গে থেকেছেন, তোমরা একসঙ্গে খেয়েছ, শুয়েছ, তর্ক করেছ, জেলে গেছ।" তা ছাড়া, একটু

থেমে মহামায়া বললেন, "আমার মান বাঁচাতে মোহনলালজি একবার প্রাণ দিতে গিয়েছিলেন।"

ঘটনাটা মনে পড়ল জয়দেব ত্রিপাঠির। তিনি ছিলেন কারাবাসে। সেবার তখনও পর্যন্ত মোহনলাল গ্রেপ্তার হন নি। পুলিশ এসেছে জয়দেবের বাড়ীতে তল্লাস করতে। মহামায়া কিছু কাগজপত্র সাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে রেখেছিলেন। দারোগার সন্দেহ হ'তে হঠাৎ মহামায়ার সাড়ীতে সে হাত লাগিয়েছিল। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মোহনলাল। দারোগার গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন দারুণ ক্রোধে। "জয়দেবজির ধর্মপত্নীর গায়ে হাত দিয়েছ, তোমায় মেরেই ফেলবো," বলে চীৎকার করে উঠেছিলেন। দশটা পুলিশ একসঙ্গে আক্রমণ করে ভয়ংকর আহত করেছিল মোহনলালকে। তা নিয়ে বিরাট হৈ চৈ হয়েছিল। কিন্তু মহামায়ার সম্মান বেঁচেছিল, কাগজপত্রগুলিও পুলিশের হস্তগত হয় নি। জেলে বসে খবর পেয়েছিলেন জয়দেব। পত্রে মোহনলালকে জানিয়েছিলেন, "তুমি আমার পরিবারের মান রক্ষা করেছ। কোনও দিন জীবনে আমি একথা ভুলব না।"

ভুলে গিয়েছিলেন। মনে করিয়ে দিলেন মহামায়া। অস্বস্তি লাগল জয়দেবের। মেজাজের মৌজ কেটে গেল।

"সেদিন আর নেই। সে মোহনলালও আর নেই। একদিন সে বন্ধু ছিল, বন্ধুত্ব পেয়েছে। আজ সে শত্রু। পাবে শত্রুতা।"

মহামায়া চুপ ক'রে গেলেন। দিন পনের আগে তিনি মোহনলালের একখানা চিঠি পেয়েছিলেন; স্বামীকে বলেন নি। মোহনলাল লিখেছিলেন, "ভাবীজি, বড় দুঃখে আমাকে জয়দেবের বিপক্ষে নামতে হয়েছে। সতী সাধ্বা স্ত্রী আপনি, পতি নিন্দা আপনাকে শোনাতে চাই নে। কিন্তু আমার একদিনকার অনেক শ্রদ্ধার জয়দেব আজ আর নেই। তার নেতৃত্ব মেনে নিলে ভগবানের কাছে অন্যায় করা হবে। তাই আমি, পরাজয় নিশ্চিত জেনেও, জয়দেবের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য আন্দোলন করছি। জানি সে জিতবে,

আমি হারবো। জয়লাভ ক'রে সে আমার বিরুদ্ধে অনেক কিছু করতে চাইবে, কেননা, ক্ষমতা তাকে মাতাল করেছে। তার জন্যে কোনও নালিশ আমার নেই, থাকবে না। আমি জানি, অনেক অপবিত্র পরিবেশেও আপনি শুচিশুভ্র মন নিয়ে পতির মঙ্গল কামনা করছেন। আমাদের নিবিড় বন্ধুত্বের দীর্ঘ অতীতকে সাক্ষী রেখে আপনাকে শুধু এইটুকু জানাতে চাই, জয়দেবকে যদি কোনও মতে সমর্থন করবার ক্ষেত্র খুঁজে পেতাম, তাহলে তার বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াতাম না।"

মহামায়া সে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন দু'চার কথায়। "আপনার ধর্ম, ভগবান ও বিবেক যে পথে আপনাকে টানবে, সে পথে আপনি যাবেন বৈ কি? শুধু আমিই বোধকরি অতীতকে ভুলতে পারি না। লক্ষ্মীনারায়ণের কাছে আপনার মঙ্গল প্রার্থনা করি।"

জয়দেব ত্রিপাঠি এবার শুয়ে পড়লেন। মহামায়া মশারী ফেলে চারদিকে গুঁজে দিলেন। মশারীর নীচে শোওয়া জয়দেব ত্রিপাঠির বহুকালের অভ্যেস; মন্ত্রী হ'য়েও ত্যাগ করেন নি। মশারীর মধ্যে নিজেকে বেশ নিরালা মনে হয়, সব কিছু থেকে আড়াল-করা। জীবন থেকে আড়ালে গিয়ে জয়দেব ত্রিপাঠি দৈনন্দিন দেনা-পাওনার একটু হিসেব-নিকেশ করেন, যতক্ষণ-না ঘুম আসে। মাঝে মধ্যে মহামায়াকে ধরে রাখেন হিসেবটা যখন সরবে করতে চান। আজও তাই ইচ্ছে ছিল। মোহনলালকে পরাস্ত ক'রে আগামী নির্বাচনে নিজের সাফল্য কীভাবে সুনিশ্চিত করেছেন মহামায়াকে তা শোনাতে পারলে তৃপ্ত হতেন। কিন্তু মহামায়া নারীসুলভ অতীত-প্রবণতার সঙ্গে বহুদিন আগের একটা বন্ধুত্ব-বিকশিত জীবন-অধ্যায়ের উল্লেখ ক'রে মনটাকে সামান্য ক্ষুণ্ণ ক'রে দিয়েছেন। যে মৌজ নিয়ে শোবার ঘরে এসে-ছিলেন, তার অনেকখানি কেটে গেছে।

তোষকের কিনারে মশারী গুঁজতে গুঁজতে মহামায়া আপন মনে বললেন, "বন্ধুত্বের কি কোনও দাম নেই।"

"নিশ্চয় আছে," শু'য়ে জবাব দিলেন জয়দেব ত্রিপাঠি। "কিন্তু যে বন্ধু শত্রুতে পরিণত হয়, সে হয় সবচেয়ে শয়তান শত্রু।"

"তুমি খুব ভাল ক'রেই জানো যে মোহনলালজি শয়তান নন, সৎ ও নিঃস্বার্থ।"

বাঁকা হেসে জয়দেব বললেন, "মন্ত্রীত্ব পাবার আগে সবাই সৎ ও নিঃস্বার্থ বলে খাতির পায়। যতো অখ্যাতি সব মন্ত্রীদের।"

"তুমি এও জানো যে মোহনলালজি মন্ত্রী হ'তে চান নি।"

"মন্ত্রী হ'তে চান নি? ওর ওসব কথা তুমি বিশ্বাস করেছ? পাগল হ'য়ে গেলে তুমি! মন্ত্রী হ'তে চায় না এমন কি একজন মানুষও আছে ভারতবর্ষে!"

মহামায়া আর কথা বাড়ালেন না। জয়দেব হয়তো বা সত্যিই বলছেন। তবু এই ভাল যে মোহনলাল মন্ত্রী হন নি, সাধারণ মানুষ র'য়ে গেছেন। সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত তাঁকে অসাধারণ জীবনের অত্যাচার সহ্য করতে হচ্ছে না।

মহামায়া বিদায় নিয়ে দরজা পর্যন্ত পৌঁচেছেন এমন সময় জয়দেব ত্রিপাঠি তড়াক ক'রে উঠে বসলেন। হাঁকলেন:

"শোন!"

মহামায়া পেছন ফিরে দাঁড়ালেন।

"আজ একটা মজার ব্যাপার হল। মিটিং থেকে বেড়িয়ে গাড়ীতে আসছি, হঠাৎ নজর পড়ল একটা মানুষের মুখে। বড় চেনা চেনা লাগল, কিন্তু কিছুতেই চিনতে পারলাম না। ছিপছিপে লম্বা, বয়স আমাদেরই মত, রোদে-পোড়া রংটা একসময় বোধ করি খুব ফর্সা ছিল। মাথা-জোড়া টাক, চোখে নিকেল ফ্রেমের চশমা। সঙ্গে একটি ছেলে, বয়স কুড়ি বাইশ হবে, বেশ বুদ্ধিমান দেখতে। এতো চেনা চেনা লাগল, অথচ কিছুতেই মনে হল না কোথায় দেখেছি।"

মহামায়া কয়েক মুহূর্ত চুপ ক'রে রইলেন। তারপর বললেন,

"কতো লোককেই তো একদিন তুমি খুব চিনতে, আজ চিনতে পারো না। এ নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

"তোমার সব কথাতেই একটা খোঁচা থাকে," একটু রুষ্ট হয়ে ত্রিপাঠি জবাব দিলেন। "জীবনের পট বদলাবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছু পরিবর্তন হয়, হওয়াই স্বাভাবিক। আজ যদি আমি একদিনকার চেনা সব লোকদের সঙ্গে ভাব জমাই তাহলে আমার মর্যাদা থাকে? মানুষের আবদারের নীচে চাপা প'ড়ে আমি নিশ্চিহ্ন হব না? এ দেশে মানুষ কেবল চাইতে আসে। কাউকে একটু প্রশ্রয় দাও, তখুনি সে চাইবে হয় পারমিট, নয় ছেলের চাকরী, নয় নিজের প্রমোশন।"

"তাহলে এ মানুষটাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন?"

"না, ঠিক মাথা ঘামাচ্ছি না, কিন্তু মুখটা যেন মন থেকে সরতে চাইছে না। চিরদিনই আমার ভুলো মন, মানুষের নাম ও মুখ কেবল ভুলে যাই। আজকাল আরও বেড়েছে। এত লোক দিনরাত জ্বালাতন করে যে কারুর মুখও মনে থাকে না। অথচ এ মানুষটাকে আমি একদিন খুব বেশী জানতাম।"

'জানতে বৈ কি! খুব বেশী করেই জানতে।"

জয়দেব ত্রিপাঠি বিস্ময়ে হতবাক হলেন। "তুমি তাহলে ওকে চিনতে পেরেছ!"

"কেন পারবো না? আমি তো মন্ত্রী হই নি?"

খোঁচা খেয়ে জয়দেব এবার রাগলেন না। স্ত্রীর কাছ থেকে সূঁচ-ফোটানো ব্যবহার তাঁর গা-সহা হ'য়ে আছে। মহামায়া তাঁর মন্ত্রী জীবনে বিপক্ষ দলের নেতা। মহামায়া বোধহয় চান জয়দেব ত্রিপাঠি এখনো তে-রঙ্গা পতাকা নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় শোভাযাত্রার নেতৃত্ব করেন, প্রত্যেক বছর তিনমাস কারাবাস করেন। মহামায়ার খোঁচা উপেক্ষা ক'রে তিনি বললেন, "শিঘগির বল লোকটা কে?"

মৃদু স্বরে মহামায়া বললেন, "প্রকাশ দুবে।"

"না! না! কক্ষনো না!" চেঁচিয়ে উঠলেন জয়দেব ত্রিপাঠি।

"প্রকাশ দুবে ও তার ছেলে প্রতাপ।"

"তুমি কি ক'রে জানলে ?"

"এখানে এসেছিলেন ক'দিন আগে আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"বলো কি! আমার সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল প্রকাশ ?"

"তুমি ব্যস্ত ছিলে।"

"কিসে ব্যস্ত ছিলাম ?"

'তোমার রাজকার্যে। তিনি হয়তো তোমাকে বিরক্ত করতে চান নি।"

বিস্ময়ের শেষ রইল না জয়দেব ত্রিপাঠির। প্রকাশ দুবে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুতর ঘটনার জীবন্ত প্রতীক। দু'জনে একসঙ্গে পড়েছেন, এক হষ্টেলে থেকেছেন। ওরকম মেধাবী, সৎ ও কর্তব্যনিষ্ঠ ছেলে কলেজে আর ছিল না। ওরকম নির্ভীক, তেজী, দুঃসাহসী। জয়দেব ছিলেন জমিদারের ছেলে, প্রকাশের বাবা ছিল দরিদ্র পুরোহিত। জলপানির টাকায় সে পড়তো। তার কাছে পাঠ নিয়ে, তার নোট মুখস্ত ক'রে জয়দেব পাটনায় প্র্যাকটিশ শুরু করলেন, প্রকাশ চলে গেল ভাগলপুরে কলেজে পড়াতে। ছুটিতে পাটনায় এলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দুজনের একসঙ্গে কাটতো। প্রকাশ রাজনীতির বহুদূরে, বিদ্যাচর্চা ও মাষ্টারীতে ডুবে থাকতো, জয়দেবের সঙ্গে কোন স্বার্থের সংঘাত তার ছিল না। তার কাছে বসে জয়দেব নানা বিষয় আলোচনা করতেন, দেশের ও বিদেশের নানা সমস্যা নিয়ে। নিজে তিনি কোনও দিন পড়তে ভালবাসতেন না, কোর্টে যেতেন, কিন্তু রোজগার হত না, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু প্রকাশের কাছে বসে জ্ঞান আহরণে তাঁর ক্লান্তি আসতো না। বস্তুতপক্ষে, জয়দেব ত্রিপাঠির নিজস্ব মতামত প্রায় কোনও বিষয়েই ছিল না, যা তিনি বলতেন বা ভাবতেন তার বেশির ভাগ প্রকাশের কাছে পাওয়া। জয়দেবের বিবেক-রক্ষক ছিল প্রকাশ দুবে। সে বহু বছর আগের কথা।

এমন সময় একটা ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল। জমিদারের ছেলে দেশ-সেবক জয়দেব ত্রিপাঠি জীবনটাকে বিশুদ্ধাচারের আশ্রম ব'লে অবশ্যই মনে করতেন না। জেলে যেতেন, দেশের কাজ করতেন, আবার অবসর মত উপভোগও করতেন। শহরের একটি গরীব কেরাণীর রূপসী কন্যা মেনকার প্রতি জয়দেবের লোভ হয়েছিল। অনেক কৌশলে বাবাকে হাত ক'রে মেনকাকে তিনি অধিকার করেছিলেন। কিন্তু একদিন বিপদ এল ঘনিয়ে। জয়দেব সে বিপদ থেকে রেহাই পেলেন না। মেনকার বাবা দাবী তুলল, মেয়েকে বিয়ে কর; অনেক টাকা দিয়েও তিনি তাকে দ্বিতীয়বার বশে আনতে পারলেন না। ব্যাপারটা আদালতে উঠবার উপক্রম হল। জয়দেবের সমস্ত খ্যাতি, উচ্চাশা, বংশের মান ডুববার উপক্রম হল। কোনও উপায় না খুঁজে পেয়ে তিনি প্রকাশ দুবের শরণাপন্ন হলেন। যদি কোন পথ পাওয়া যায়।

ঘটনা শুনে প্রকাশ স্তম্ভিত হল। মেনকাকে সেও চিনতো। জয়দেবের ওপর যত না রাগ হল মেনকার জন্য দুঃখ তার চেয়ে বেশি। জয়দেবকে সে যা পরামর্শ দিল তা তিনি গ্রহণ করতে অক্ষম। সে বলল, "তুমি যে অন্যায় করেছ তার ক্ষমা নেই।"

"জানি," জয়দেব নিস্তেজ কণ্ঠে জবাব দিলেন। "এরকম হবে একটুও ভাবিনি।"

"ভাবী ব্যাপারটা জানেন?"

"এখনও জানেন না, তবে আদালত হ'লেই জানবেন।"

"তাঁর কাছে তুমি মুখ দেখাচ্ছ কি করে?"

জয়দেব দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলেন।

"আমার কথা শুনবে? তুমি ভাবীকে সব খুলে বল। তাঁর সম্মতি নিয়ে মেনকাকে বিয়ে কর। তোমাদের সমাজে অনেকের একাধিক পত্নী আছে।"

"তা হয়না," জয়দেব আর্তস্বরে বললেন। "তুমি মহামায়াকে

জান না। আমার সংসার যাবে, আমার রাজনীতি যাবে। আমি আর নেতৃত্ব করতে পারবো না।”

প্রকাশ দুবে নীরব হল। জয়দেব কিছুক্ষণ ব’সে বিদায় নিলেন।

তিনদিন পর প্রকাশ দুবে এল জয়দেবের বৈঠকখানায়। অদ্ভুত শান্ত, গম্ভীর তার চেহারা। জয়দেবকে সে বলল, “মেনকাকে আমি বিয়ে করছি।”

“সে কী?”

“তোমার জন্য নয়, তার জন্য। তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে তোমায় ঘৃণা করে। না বুঝে, বাপের প্ররোচনায়, তোমার প্রতারণায় ভুলে সে তোমার লালসার আগুনে নিজেকে পুড়িয়েছে। তুমি তাকে এমন জায়গায় এনেছ যেখানে মৃত্যু ছাড়া তার গতি নেই। আমি তোমার মত দেশসেবা করি নে। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার মহান দুঃসাহস আমার নেই। কিন্তু তোমার দেশসেবার মূল্য যদি আমাদের এমনি ক’রে দিতে হয় তাহলে ভগবান আমাদের রক্ষা করুন। তুমি নেতা হও, আমি অন্তত একটি জীবনকে বাঁচাই।”

জয়দেব একটা কথাও বলতে পারেন নি।

প্রকাশ উঠে দাঁড়াল। যাবার সময় বলে গেল, “আমি মেনকাকে নিয়ে কাল রাত্রে চলে যাচ্ছি। লোকে বলবে, আমরা পালিয়েছি। তা বলুক। কলকাতায় গিয়ে আমি ওকে বিয়ে করবো। তারপর হয়তো ওখানেই থাকব, নয়তো চলে যাবো আর কোথাও। তোমাকে একটা কথা বলে যাই। মেনকার প্রথম সন্তানকে আমি পিতার মতো গ্রহণ করবো। সে শিশু নিষ্পাপ, পবিত্র হ’য়েই আসবে। শুধু তুমি কোনও দিন আমার আর ছায়া মাড়াবে না।”

প্রকাশ দুবে পরের দিন রাত্রে মেনকাকে নিয়ে ‘পালিয়েছিল’। শহরে এ-নিয়ে হৈ-চৈ হল, তার একটি শব্দও জয়দেব ত্রিপাঠির কানে ঢোকে নি। প্রকাশ দুবের কোন খোঁজ তিনি করেন নি। দু’ বছর পর প্রকাশই আবার তাঁর কাছে এসেছিল। সশরীরে নয়, একখানা

ছোট পত্রে। লিখেছিল, "তিন দিন আগে মেনকার মৃত্যু হয়েছে। টাইফয়েড হয়েছিল, অনেক চেষ্টায়ও বাঁচাতে পারলাম না। আমার ছেলেকে নিয়ে আমি অনেক দূর দেশে চলে যাচ্ছি। মেনকাকে পেয়ে আমি সুখী হয়েছিলাম। মরেও সে আমায় পরিপূর্ণ রেখে গেছে। কিন্তু তোমাকে সে কোনও দিন ক্ষমা করে নি। মরবার আগের দিন বলে গেছে, একথাটা যেন তোমাকে লিখে জানাই।"

নিস্তব্ধ রজনীতে মশারীর মধ্যে ব'সে জয়দেব ত্রিপাঠির সব কথা আজ মনে হল। মহামায়া চলে গেছেন। জয়দেবের সন্দেহ হয়েছে তিনি সব ব্যাপারটাই জানতেন, যদিও কোনদিন কিছু বলেন নি। সেই প্রকাশ দুবে 'তার' ছেলেকে নিয়ে আজ এসেছিল জয়দেবের বক্তৃতা শুনতে। কেন। কেনই বা সে এসেছিল জয়দেবের বাড়ীতে মহামায়ার কাছে? জয়দেব ত্রিপাঠি এ রহস্যের সমাধান করতে পারলেন না। কি চায় প্রকাশ দুবে? ছেলের জন্য চাকুরী? তা অবশ্যই জয়দেব ত্রিপাঠি ব্যবস্থা করতে পারেন! নিজেরও কোন সুবিধে! তাও অসম্ভব নয়। কিন্তু তেমন লোক তো সে ছিল না! অবশ্য, মানুষ বদলায়। জয়দেব ত্রিপাঠি নিজেই কি কম বদলেছেন? প্রকাশ দুবের চেহারা কী ভীষণ বদলে গেছে!

ঘুম এলো না জয়দেবের। শয্যা ত্যাগ ক'রে ঘরের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন কিছুক্ষণ। সে অতীত ছিল মৃত, একান্ত নিঃশেষিত, সে হঠাৎ ফিরে এসে তার অস্থি-কংকাল নিয়ে চতুর্দিকে নেচে বেড়াতে লাগল। ভয় পেলেন জয়দেব ত্রিপাঠি। দরজা খুলে বাইরে এলেন। নিঝুম, নিশ্চুপ রাত্রি। ফটকের পাশে প্রহরী দেয়ালে হেলান দিয়ে ঘুমুচ্ছে। চতুর্দিকে নিদ্রার নিস্তরঙ্গ প্রশান্তি। সবুজ ঘাসে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন জয়দেব ত্রিপাঠি। মহামায়া নিঃসন্তান। জয়দেবের জীবনে ঘটনার অভাব হয়নি—সবচেয়ে বড় ঘটনা তাঁর দেশসেবা, যার মূল্য বর্তমানের এই গৌরবান্বিত জীবন। কিন্তু জনক হয়েও তিনি পিতা হ'তে পারেন নি।

মহামায়াকে একদা তিনি দেশ সেবায় নামিয়েছিলেন; ভেবেছিলেন মা না-হওয়ার শূন্যতা তাতে আংশিক ভরবে, তাঁর বিজয় গৌরবও বাড়বে। কিন্তু মহামায়া নিয়ে এলেন তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আন্তরিক নিষ্ঠা; রাজনীতিতে তা অচল।

সার্থকতা নামক ভেজাল পদার্থ উপভোগ করতে হ'লে রুচিকে ব্যাপক ও সর্বভুক করা চাই। মহামায়ার কাছে জীবন পূজার ঘর। সেখানে অশুচি, অপবিত্র, উচ্ছিষ্ট ও ভেজালের প্রবেশ নিষেধ। সুতরাং জয়দেব ত্রিপাঠির সার্থকতায় মহামায়া ফাঁকিটুকুই বড় করে দেখেন। মা হ'লে হয়ত অন্যরকম হ'তেন। সন্তানকে মানুষ করতে গিয়ে দেখতেন কত দুর্বলতা তাঁর অস্থি-মর্জায়। স্ত্রীর প্রেম আছে, ভক্তি আছে, শ্রদ্ধা আছে। ক্ষমা নেই। ক্ষমা জননীর ধর্ম, জায়ার নয়।

পুরুষ পিতা হলে যে পরিবর্তন হয় জয়দেব ত্রিপাঠি সে সুযোগ পান নি। পিতৃত্ব শৃঙ্খলা আনে, দায়িত্ববোধ আনে। প্রতিটি প্রলোভন মনকে সতর্ক করে, স্বতস্ফূর্ত সংযম এসে যায়। মনে হয় আমার পানে তাকিয়ে আছে আমার পুত্র, আমার সন্তান; আমি তার পিতা, সে হাত পাতবে আমার কাছে, বলবে, জীবনের পথ কোথায়, পাথেয় কী; বলবে কী তুমি পেয়েছ, আমায় দাও।

হঠাৎ বড় নিঃসঙ্গ মনে হল জয়দেব ত্রিপাঠির, মনে হল অনেক পুরস্কার, অনেক ক্ষমতা পেয়েও তিনি নিঃস্ব। যা পেয়েছেন তাতে যেন তাঁর প্রকৃত অধিকার নেই। এ পাওনা যেন কাউকে হাত ভরে দেওয়া যায় না। আজ যদি জয়দেব ত্রিপাঠির পুত্র থাকত, তাকে বুঝি তিনি দিতে পারতেন না, পিতা যেমন পুত্রকে দেয়, গুরু যেমন শিষ্যকে, পথের দীক্ষা। একটি বুদ্ধিদীপ্ত যুবকের মুখ ভেসে উঠল জয়দেবের চোখে; বুকটা টনটন করল; কিন্তু মন বলল, তুমি পিতা হ'তে পারো নি, পিতৃযান তোমার নেই, তুমি যোগভ্রষ্ট।

দরজায় শব্দ শুনে মহামায়া উঠলেন। খুলে দেখেন, জয়দেব।

"ঘুম আসছে না।"

"কেন? শরীর খারাপ হয় নি তো?"

"মাথাটা ঝিম ঝিম করছে।"

"ডাক্তারকে খবর দেব?"

"দরকার নেই।"

"চল তুমি শোবে।"

"না। এখানেই একটু বসি।"

মহামায়া চিন্তিত দৃষ্টিতে তাকালেন স্বামীর মুখে।

"প্রকাশ এখানে কেন এসেছিল?" একটু পরে জয়দেব প্রশ্ন করলেন।

"আমি আসতে অনুরোধ করেছিলাম।"

"ও। তা তুমি কি করে জানলে ও শহরে এসেছে?"

"কেন? সেদিন কাগজে দেখলাম উনি বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দিয়েছেন।"

"তাই বুঝি! আমি তো দেখি নি!"

"তার মানে তোমাকে দেখানো হয় নি!"

"কি বিষয়ে বক্তৃতা দিল?"

"ঠিক মনে নেই। দার্শনিক মানুষ, রাজনীতি নিশ্চয় নয়।"

"তুমি ওকে ধরলে কি করে?"

"এমন কি আর শক্ত কাজ সেটা।"

"না, শক্ত নয়। ওকে ডাকলে কেন?"

"দেখব বলে। ওঁর ছেলেটিকে এর আগে তো দেখি নি।"

চমকে উঠলেন জয়দেব ত্রিপাঠি। "কেমন দেখলে?"

"চমৎকার ছেলে। অনেক বছর বিলেতে থেকেও একেবারে দিশী? এবছর এম. এ. পাশ করল, ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে।"

"প্রকাশ কি করে?"

"বরোদায় কোন একটা কলেজে পড়ান।"

"ছেলেটি ?"

"মাষ্টারের ছেলে মাষ্টার। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ পেয়েছে।"

"দুজনের সম্পর্ক কেমন ?"

"খুব ঘনিষ্ঠ। হবে না কেন ? মা-হারা সন্তানকে কোলে পিঠে ক'রে মানুষ করেছেন প্রকাশই তো। বাপ শিক্ষকতা করেন, তাই ছেলেও বেছে নিয়েছে বাপের পথ।"

"প্রকাশ আর বিয়ে করে নি ?"

"না।"

"প্রকাশ কী আমার কথা কিছু বলল ?"

"তুমি কেমন আছ জিজ্ঞাসা করলেন।"

"দেখা করতে চাইল না ?"

"না।"

"কোথায় আছে সে ?"

"কেন ? তুমি যাবে নাকি ?"

"ডেকে পাঠাতে পারি।"

"তা কোরো না।"

"কেন ?"

"হয়তো আসবেন না।"

"কিন্তু আমার বক্তৃতা শুনতে সভায় এসেছিল !"

"ভুল করছ। তোমার বক্তৃতা শুনতে নয়।"

"তবে ?"

"ডাক্তার সর্বাধিকারীর বক্তৃতা শুনতে।"

"তুমি কি ক'রে জানলে ?"

"সেদিন বলছিলেন, সভায় যাবেন।"

শোবার ঘরে ফিরে যেতে বড় দুর্বল মনে হল জয়দেব ত্রিপাঠির। হাটু যেন ভেঙ্গে আসছে। ক্লান্ত দেহকে বিছানায় শুইয়ে তিনি চিন্তাকে চালিত করবার চেষ্টা করলেন অন্য পথে। ভাবলেন মোহনলালের

পরাজয়ের কথা। আজ তাঁর জীবনে বিরাট সাফল্য। অন্তত আরও পাঁচ বছরের জন্য তাঁর মন্ত্রীত্ব নিশ্চিত। কিন্তু এ চিন্তায় মন বসল না। আবার বেরিয়ে এল মৃত অতীতের প্রেতমূর্তিগুলি। আবার তারা দৌরাত্ম্য করতে লাগল নিদ্রাহীন অন্ধকারে। ঘেমে উঠলেন জয়দেব ত্রিপাঠি। মনে রইল না তিনি মন্ত্রী, কত তাঁর ক্ষমতা, কী প্রচণ্ড তাঁর প্রতাপ। মনে হল জীবনের জটাজালে আবদ্ধ তিনি একটি অসহায় বৃদ্ধ। একটি অসহায় শিশু।

প্রভাত হবার আগেই জয়দেব উঠে পড়লেন। বাগানে দীর্ঘকাল পায়চারি ক'রে প্রভাতী শ্রমাভ্যাস সাধন করলেন। স্নান সেরে পূজার ঘরে ঢুকে নিত্যকার পূজা সাঙ্গ ক'রে দপ্তর ঘরে এসে যখন উপস্থিত হলেন, তখন তিনি পুরোদস্তুর মন্ত্রী। গত দিনের জয়ের জন্যে অভিনন্দন জানাতে, নতুন কলাকৌশল প্রণয়ন করতে, দলীয় চেলারা ভিড় করেছে ; তাদের মধ্যে বসে জয়দেব অন্য মানুষ, অর্থাৎ মন্ত্রী-মানুষ, হলেন। শাসনকার্যের নানাবিধ জটিল সমস্যায় তাঁর মনপ্রাণ ডুবে গেল।

এরা বিদায় হলে এল অন্য লোক। তারা বিদায় হ'লে আবার নতুন লোক। এল দপ্তরের উঁচু উঁচু ভুড়িদার ডবল-চিবুক, টাক-মাথা কর্ণধারগণ, ঘন ঘন বেজে উঠল টেলিফোন। এমনি ক'রে সকাল গেল কেটে, এলো মধ্যাহ্ন।

জয়দেব ত্রিপাঠি উঠলেন। আনমনা হ'য়ে ভিতরের দিকে চলতে গিয়ে এসে দাঁড়ালেন বাইরের ফটকে। দৌড়ে এল চারজন কর্মচারী। সবাইকে বিদায় দিলেন। প্রহরীকে বললেন, একটা ট্যাক্সি পেলে থামাস তো।

খানিক পরে, সবাইকে অবাক ক'রে, জয়দেব ত্রিপাঠি ট্যাক্সিতে বসলেন। মস্ত সেলাম ঠুকে চালক প্রশ্ন করলো, হুজুর, কোথায় যাবেন।

একটা সাধারণ হোটেলের নাম করলেন জয়দেব ত্রিপাঠি।

চোখে কালো কাচের চশমা ও মাথায় চাদর জড়িয়ে জয়দেব

হোটেলের দাঁত-বার-করা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলেন। একটা চাকর দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়, ডেকে জিজ্ঞেস করলেন বত্রিশ নম্বর ঘরখানা কোথায়?

ডান কোণের শেষ ঘরটায় এসে থামলেন জয়দেব ত্রিপাঠি। বুক কাঁপছে, হৃদস্পন্দন বাজছে কানে। পা অবশ হ'য়ে গেছে। হাতে জোর নেই।

দরজায় মৃদু আঘাত করলেন জয়দেব। উত্তর না পেয়ে আবার আঘাত করলেন, একটু জোরে।

দরজা খুলল সেই ছিপছিপে, রোদে-পোড়া-রং নিকেল চশমা-পরা মানুষটি, যাকে আগের দিন জয়দেব ত্রিপাঠি কিছুতেই চিনতে পারেন নি।

"প্রকাশ?" রুদ্ধ গলায় চাপা আওয়াজ করলেন জয়দেব ত্রিপাঠি।

"আপনি কে?" জবাব এল মানুষটির কণ্ঠ থেকে।

"প্রকাশ! তুমি আমায় চিনতে পারছ না!"

"না তো!"

"আমি জয়দেব! জয়দেব ত্রিপাঠি!"

"আমি তো আপনাকে চিনি না!"

"চেন না? তুমি আমাকে চেন না?"

"না।"

"এ কি বলছ তুমি প্রকাশ! আমি জয়দেব ত্রিপাঠি! মন্ত্রী! আমাকে সবাই চেনে।"

"আমি আপনাকে চিনি না। আপনি যান।"

দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জয়দেব আবার ভুলে গেলেন তিনি মন্ত্রী। আবার মনে হল, বড় অসহায় এক বৃদ্ধ তিনি। বড় অসহায় এক শিশু।

দুই কবি

পণ্ডিত মহাবীর মিশ্র, বিরাট দেহ, উদরাধ্মান, পৃথিবীর মত গোল মুখ, টাক মাথায় নাতিপ্রচুর আধ-পাকা চুল, ছোট ছোট গর্তে-ডোবা চোখ, মার্জার-গুম্ফ, পান খাওয়া কালো জীর্ণ দাঁত, তিন-ভাঁজ চিবুক ; পেশা সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপনা, তার সঙ্গে সন্ধ্যা-শেষে হিন্দী সংবাদপত্রে খুচরো সম্পাদকীয় রচনা। শহরে হেন মানী ব্যক্তি নেই মহাবীর মিশ্র যাঁর দোস্ত নন। সর্বত্র তাঁর জন্যে অবারিত দ্বার।

তিনি কবি।

আটচল্লিশ বছর বয়সে প্রথম পত্নী স্বর্গগতা হলে গার্হস্থ্য ধর্মের কঠিন তাড়নায় মহাবীর মিশ্র আঠার বৎসর বয়সের যে যুবতীর পাণি-গ্রহণ করেন তাঁর উৎপাদিকা শক্তি মিশ্র-ভবনে চারটি মানবশিশুর আবির্ভাব ঘটিয়েছিল, তাদের দুজন জীবিত। প্রথম পত্নীর অবদান সাত পুত্র-কন্যার তিনটি এখনও বাল্য-কৈশোরের স্তরে আটকে আছে। লোদি কলোনীর এক সরকারী ফ্ল্যাটের নীতিবাগীশ অধিকারী ষাট টাকায় দেড়খানা ঘর মহাবীর মিশ্রকে নিতান্ত অনিচ্ছায়, কেবল করুণায়, ভাড়া দিয়েছে ; এই স্বল্প-প্রসার সংসারে পাঁচ পুত্র-কন্যা, এক পত্নী পরিবৃত জীবনে, কলেজে একপাল গাধা চালিয়ে, রাত্রিতে সম্পাদকের সঙ্গে নিত্য কলহে, ত্যক্ত-বিরক্ত জর্জরিত মহাবীর মিশ্রের একমাত্র জীবনস্বাদ স্বরচিত কবিতা। তার প্রত্যেকটি কবির কণ্ঠস্থ। হিন্দী কবিতা গানের সুরে আবৃত্তি করা হয়। কবির দুর্ভাগ্য তিনি বৃষকণ্ঠ, কিন্তু তাতে পরাস্ত নন।

মনমোহন দাঁ, পাঁচ ফুট দুই ইঞ্চি লম্বা, শীর্ণ দেহ, জীর্ণ বাস, হাড়ল চোয়ালে কুঞ্চিত চামড়া এঁটে বসেছে, বড় বড় ক্ষুধার্ত অসহায় দরিদ্র চোখের ওপর দু-ঝোপ ভ্রূ ; সরু সোজা নাকের নীচে এক

ঝোপ গোঁফ, ঢালু নয়ন চিবুক, কণ্ঠনালী ভয়াবহ প্রক্ষেপে প্রকটিত ; চকচকে দাঁতের চারটি বিচ্যুত ; পেশা অধ্যাপনা, কলেজেই ; তবে সে কলেজ পঞ্জাবী ব্যবসায়ীর বিদ্যা-বিপণি, এবং ছাত্র-পিছু দুটাকা অধ্যাপকের দক্ষিণা। মনমোহন দাঁ শহরে বড় একটা কাউকে চিনতেন না, চিনবার ভরসাও নেই, তিনি দীন, এবং আমরা সবাই জানি, রাজধানীর সরকারী-চাকুরে-সমাজে, বিশেষ করে তার বঙ্গভাষী অংশে, দীনের দ্বার সর্বদা অবরুদ্ধ। তথাপি মনমোহন দাঁ বেঁচে ছিলেন একটি নির্জন নিঃসঙ্গ আত্ম-বিলাস অবলম্বন করে।

তিনিও কবি।

॥ দুই ॥

এক সময় চট্টগ্রামে মাস্টারী করতেন। কোন একদিন, সেই বহু-দূরের অতীত যৌবনে, সাগরের অতল জল কি আহ্বাণে ডাকল, চলে গেলেন মালয়। এক চীনে চিনেবাদাম ব্যবসায়ীর ছেলেকে বাড়ীতে পড়াতেন, স্কুলে শিক্ষকতার বাড়তি ; একদিন তার এক অক্ষমনীয় অপরাধে কুপিত হয়ে প্রহার করে বসলেন। চিনেবাদামী চীনের এমন সুনজরে পড়লেন, পালাতে হল বর্মায়। সুখে-দুঃখে জীবন মন্দ কাটছিল না ; বিয়ে করে সংসারী হয়ে তিন কন্যার পিতা ছোট্ট ভুরি নিয়ে আরামের আসন পেতে বসবেন, এমন সময় সেই অবিশ্বাস্য ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটল, যার নাম বিশ্বযুদ্ধ। হাজার হাজার বাঙ্গালীর সঙ্গে অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে মনমোহন দাঁও মাতৃভূমির উদ্দেশ্যে পলাতক হলেন।

পথে স্ত্রী বিদায় নিয়ে বোঝা হালকা করলেন। তিনটি অস্থিচর্মসার কন্যার হাত ধরে জীবন্ত কংকাল মনমোহন দাঁ যখন কলকাতা পৌছলেন, তৃপ্তি ও আনন্দের সঙ্গে দেখতে পেলেন এককালের আত্মীয়-স্বজনেরা স্বাভাবিক জৈব কারণে তাঁকে আর চিনতে পারছেন না। যুদ্ধকাল সুকাল, চাকরী পেতে ঐ চেহারায়ও

দেরী হল না। আবার জীবন চলল, তবে ছন্দে নয়, গদ্য-গতিতে। এতক্ষণে আত্মীয়-স্বজনেরা অতীতের স্মৃতি ঘেটে তাকে আবিষ্কার করলেন। বললেন, বিয়ে করো।

দেশ যখন বঙ্গ, কাজটা নিতান্ত সহজ, বয়স যাই হোক না কেন। কিন্তু যেহেতু মনমোহন দাঁ কবি, তাই তিন কন্যার অসহায় তিনজোরা টলটলে চোখ নারী-দেহ-উপভোগের শিহরণ-সিঞ্চিত কল্পনায় বাধা দিল, তার সঙ্গে চমকিত দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন গভীর জঙ্গলাকীর্ণ নিশীথে ফোটা পুষ্পের সুবাসে বিধুর তোমার কেশ।

স্রাটসিস গাইলো আরো মধুর, আরো নীচু সুরে,—আমার কেশপাশ অন্তহীন নদী-প্রবাহ, তাতে জ্বলন্ত সূর্যাস্তের শেষ সমারোহ।

—আঁখি ছুটি তোমার বিকচ স্থলপদ্ম, জলের ওপর ফুটে আছে অচঞ্চল, সুনীল আর বৃন্তহীন।

—পল্লব প্রচ্ছায়ে আমার নয়নশতদল কৃষ্ণশাখার নীচে গভীর হ্রদ।

—ওষ্ঠপুট তোমার হরিণীর রক্তরঞ্জিত ফুল্লকুসুম।

—আমার ঠোঁট ছুটি প্রজ্জ্বলন্ত কামনায় রঙীন।

—জিহ্বা যেন তোমার রক্তঝরা তরবারি, বিদ্ধ করে আছে তোমার মুখগহ্বর।

—আমার রসনা শোভিত মূল্যবান প্রস্তরে। লোহিত হয়েছে আমার ওষ্ঠ ছায়াতে!

—গজদন্তসম সুডৌল তোমার বাহু, কুক্ষিদ্বয় যেন সুগোল ছুটি মুখ।

—আমার দীর্ঘ বাহুর গড়ন মৃণালদণ্ডের মত, চম্পক অঙ্গুলি ফুটে আছে যেন পাঁচটি ফুলের পাঁপড়ি।

—জঙ্ঘা তোমার শ্বেতহস্তীর শুণ্ডসম, চরণকমল বহন করছে এমনভাবে, যেন ছুটি রক্তরঙীন পুষ্প।

—আমার পা জলপদ্মের পত্রদল, উরু স্ফীত মৃণালদণ্ড।

—রূপার ঢালের মত তোমার যুগ্ম বক্ষ, যে ঢালের পেয়ালা রক্তে ভরপুর।

—আমার [illegible]যুগল চাঁদের মত; জলের ওপর চাঁদের ছায়ার মত।

—গোলাপি বালুর মরুতে কূপের মত গভীর তোমার নাভি, উদর তোমার মায়ের বুকে শুয়ে থাকা কচি শাবকের মত নধর নরম।

—উপুড় করা পেয়ালার মধ্যে সুগোল একটি সুন্দর মুক্তাখচিত করলে যেমন দেখায়, তেমনি আমার নাভি। আর আমার নাভি তলদেশের বঙ্কিম রেখা দূর বনান্তরাল থেকে দেখা স্বচ্ছ চন্দ্রকলার মত।

নেমে এল নৈঃশব্দ, হাত তুলে আভূমি নত হয়ে অভিবাদন করল দাসী।

নগরাঙ্গণা গেয়ে চলল।

—মধুতে সৌরভে ভরপুর এ যেন বেগুনি রঙ-এর ফুল।

—এ যেন সাগর ভুজঙ্গিনী, জীবন্ত, সরস, রাত্রির আকাশে উদ্যত এর ফনা।

—এ যেন বিপুল আশ্রয়, মৃত্যুর পথে অভিযাত্রী মানুষ সেখানে মাগে বিশ্রাম শয়ন।

ভূমিতে প্রণতা দাসী বলল, এ এক বিপুল বিস্ময়। এ যেন মেডুসার মুখ!

শিহরিত স্রাটসিস দাসীর গলার ওপর পা তুলে দিয়ে ডেকে উঠল, জালা!

রাত্রি ঘনিয়ে এল ধীরে ধীরে। আকাশে উজ্জ্বল চাঁদের নীলাভ আলো ঘর ভরে দিয়েছে। স্রাটসিস নিজের অনাবরণ দেহের দিকে তাকালো। দেহে পড়েছে নিশ্চল আলো। ছায়াগুলো ঘন কালো।

হঠাৎ সে উঠে দাঁড়ালো।

—জালা, কি ভাবছি বসে? রাত হয়ে গেল, এখনো ত বেরুলাম না। বন্দরে এখন ঘুমন্ত নাবিকরা ছাড়া আর ত কেউ থাকবেও না।

—বল ত জালা। আমি কি সুন্দরী? বল ত তুই এত সুন্দর আর কখনো কি লেগেছে আমাকে? জানিস, আলেকজান্দ্রিয়ার সব মেয়েদের মধ্যে আমিই সেরা সুন্দরী? আজ এখন আমার কটাক্ষপাতে যে কোন লোক কুকুরের মত আমাকে অনুসরণ করবে। আমি তাকে নিয়ে যা খুশি করতে পারি; ইচ্ছে করলে ক্রীতদাস পর্যন্ত বানাতে পারি! প্রথম আমি যাকেই দেখবো, তার কাছ থেকে প্রত্যাশা করবো দাসসুলভ বশ্যতা। নে জালা, আমাকে সাজিয়ে দে এবার।

জালা তার বাহুমূলে পরালো দুটি রৌপ্যময় সর্পবলয়। পায়ে দিল পাদুকা, এঁটে দিল চামড়ার ফিতে দিয়ে। ম্রাটসিস নিজেই নীবিতে বাঁধলো মেখলা। কানে পরল দুটি বৃহৎ কুন্তল। আঙ্গুলে অঙ্গুরীয়ক আর স্বনামাঙ্কিত মোহর। গলায় তিন লহরী হার।

রত্নখচিত আপনার অনিন্দ্যসুন্দর দেহের দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালো ম্রাটসিস। আলমারী খুলে বের করল স্বচ্ছ সুন্দর পীতাভ লিনেনের বস্ত্র! পা পর্যন্ত আচ্ছাদিত করল নিজেকে। পোষাকের চতুষ্কোণ ভাঁজগুলি স্পর্শ করল অঙ্গের বঙ্কিম রেখা; আবরণ করল, কিন্তু আড়াল করল না। দৃঢ়পিনদ্ধ বস্ত্রের মধ্য দিয়ে একটি কনুই তীক্ষ্ণভাবে ফুটে উঠেছিল। অপর অনাবৃত হাতে পরিচ্ছদ তুলে ধরলো ভূমিতল থেকে ওপরে।

পালকের পাখা তুলে নিয়ে সে চলতে সুরু করল। প্রাঙ্গনের সিঁড়িতে সাদা দেয়ালে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জালা তাকে চলে যেতে দেখলো।

চন্দ্রালোকসিক্ত জনশূন্য রাজপথে নিদ্রিত গৃহগুলি পিছনে ফেলে ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলো। তার পিছনে থর থর করে কাঁপতে লাগলো চঞ্চল একটি ছায়া। অচেনা, অজানা বিপন্ন পথে মুমূর্ষু

একটি রমণীর মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর জীর্ণ মুখ, বৃষ্টি-গলা মাটিতে তার অবসন্ন নিস্তেজ প্রায়-নিঃশেষ দেহ, শুনতে পেলেন সে যেন আর একবার ক্ষীণ কাতর কণ্ঠে শেষ কথা উচ্চারণ করছে, "তোমার ভার কমিয়ে দিলাম। পারো তো মেয়ে তিনটেকে বাঁচিয়ো।"

বিয়ে করা আর হল না মনমোহন-দাঁ-র।

যুদ্ধ যতদিন চলল, ততদিন, তার কিছু বেশি দিনও, চলল চাকরী। তারপর দেশে অনেক কিছু একসঙ্গে ঘটল। মারামারি কাটাকাটি, ভাগ-বিরোধ—অর্থাৎ দেশ স্বাধীন হল। মনমোহন দাঁ স্বাধীন ভারতবর্ষে বেকার হলেন। দেখতে পেলেন বড় মেয়ে সুরভি সত্যি বড় হতে চলেছে, স্কুলের শেষপ্রান্তে পৌঁছবার আগেই। দৃষ্টি আরও খুলল যখন বুঝলেন পাড়ার ছেলেরা সুরভির সৌরভ টের পেয়েছে।

কলকাতায় কর্মসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে মনমোহন দাঁ তিন কন্যার হাত ধরে আবার পথচারী হলেন। এবারে আর অতল জলের আহ্বান নয়, দিল্লীর ডাক। চলে এলেন ভারত-রাজধানী দিল্লীতে; বাহান্নর পরিণত দেহ নিয়ে নতুন জীবনের সন্ধানে।

লেখা-পড়া জানা লোক, পড়া শোনা কম করেন নি জীবনে, রেঙ্গুন প্রবাসে কলেজের ছাত্রদের জন্যে পলিটিক্স-এর একখানা কেতাব লিখেছিলেন। বাংলায় লেখা কিছু প্রবন্ধ, ইংরেজী কিছু রচনা ইতস্তত মুদ্রিত হয়েছিল। শুধু ছাপান নি কবিতা, প্রাথমিক জীবনের দু-চারটে অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার পরে। কবিতা জীবন-বিলাসের সঙ্গোপন পাথেয়, সম্পাদক-শাসিত নির্মম হাটে তাকে আর বার করেন নি।

যেমন হয়ে থাকে, রাজধানীর প্রতিষ্ঠিত বঙ্গসন্তানরা মনমোহন দাঁ-র জন্যে কিছু করতে পারলেন না। তাঁরা সব ন্যায়-নিষ্ঠ; বাঙ্গালী-পোষণ কদাচ করেন না। তবে মনমোহন দাঁ একেবারে ব্যর্থ মনোরথ হলেন না। অনেক উপদেশ পেলেন, চল্লিশ টাকার একটা ট্যুইশনও।

তিনি শাহজাহানের পুরাতন দিল্লীর অন্ধকার গলিতে তিনশ' বছরের জরাজীর্ণ গৃহে তুখানা স্যাঁতসেতে ঘরে তিনকন্যা নিয়ে ঘর বাঁধলেন। সুরভির স্কুলজীবনে ছেদ পড়ল।

যা হওয়া উচিত নয় তা হয় বলেই জীবন রহস্যময়। মনমোহন দাঁও বেশ মন্দ-নয় গোছের চাকুরী পেয়ে গেলেন। পাইয়ে দিলেন এক পঞ্জাবী সজ্জন। মনমোহন দাঁ-র সঙ্গে আলাপে তাঁর বিদ্যা-বুদ্ধিতে আকৃষ্ট হয়ে যে অস্থায়ী পদে বহাল করলেন তার কাঞ্চনমূল্য যেমন নিতান্ত কম নয়, অন্য আকর্ষণও প্রচুর। মনমোহন দাঁ এক সরকারী ম্যাগাজিনের সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হলেন।

তিন বছর কাজ করার পর মনমোহন দাঁর পঞ্চান্ন পূর্ণ হল। কর্ম থেকে অবসর পেয়ে জীবনের সব অবসর তাঁর কেটে গেল।

সামান্য কয়েক হাজার টাকা সঞ্চয় করেছিলেন। এবার এক বন্ধুর কৃপায় তাও গেল।

দপ্তরেই বন্ধুটি জুটেছিল। বছর তিরিশের সিন্ধী ছোকরা, যেমন পোষাকে ধোপতুরস্ত, তেমনি কথাবার্তায় চৌখস। চাকরী করে কেরাণীর, কিন্তু বিত্তবান। অফিসারদের তুঃসময়ে বেশী সুদে টাকা ধার দিয়ে তার বেশ মোটা বাড়তি রোজগার। বিধাতার কৃপায় অফিসার-দের তুঃসময় হামেশাই হয়ে থাকে, এবং ধারে তাদের রুচি সীমাহীন। পাঁচশো টাকা ধার দিয়ে এক বছরে সাতশো টাকা রোজগার যে ব্যবসার তার জৌলুষ অবসর-প্রাপ্তির বিভীষিকায় উৎক্ষিপ্ত মন মনমোহন দাঁকে আকর্ষণ করল।

সিন্ধী যুবক তাঁকে একটা ভাল পার্টি পাইয়ে দিল। মনমোহন দাঁ একহাজার টাকা ধার দিয়ে পনের শ' টাকার নোট পেলেন। নির্দিষ্ট অঙ্কের মাসিক কিস্তিতে টাকাটা পেয়েও গেলেন। লোভ বাড়ল।

রিটায়ার করে সিন্ধীর সঙ্গে ব্যবসায়ের উদ্যোগ চলল। সিন্ধী বোঝাল, এর চেয়েও লাভের ব্যবসা আছে দিল্লী শহরে।

মনমোহন দাঁ ঝোপ-ঝোপ ভ্রূ তুলে প্রশ্ন করলেন, কি ?

যা শুনলেন তাতে ভ্রূ নেমে এল এক মুহূর্তে, এক-ঝোপ গোঁফ ধ্বসে পড়ল।

বললেন, ও কথা থাক।

সিন্ধী বললে' জানি আপনার দ্বারা ওসব হবে না। টাকা করার জন্যে হিম্মৎ চাই, হিম্মং। বাঙালীর তা নেই।

মনমোহন দাঁর সুরভিকে মনে পড়তে লাগল। বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠল।

অপরাজিত সিন্ধী বললে, আরও সোজা পথ বাৎলাচ্ছি। তাতেও অনেক পয়সা।

ভ্রূ আবার কিঞ্চিৎ উঠল।

সিন্ধী বললে, পুরানো মোটর গাড়ী বেচা-কেনার ব্যবসা। তিন হাজারে আজ কিনবেন, চার হাজারে পর্শু বেচবেন। দুদিনে একহাজার টাকা লাভ।

মনমোহন দাঁ উৎসাহিত হলেন। ব্যবসায়ের প্রথম ফল দেখে উত্তেজিত হলেন। সিন্ধীর সাহায্যে পুরানো এক হিলম্যান গাড়ী আড়াই হাজারে কিনে সাত দিনের মধ্যে চার হাজারে বিক্রী হল।

বাড়ীতে বসে সুরভি ম্যাট্রিক পাশ করেছিল। সে কলেজে ভর্তি হল।

কিন্তু বেশি দিনের জন্য নয়। বছর না ঘুরতেই মনমোহন দাঁর সর্বস্ব গেল।

এ ঘটনার বিশদ বর্ণনা অবাঞ্ছনীয়। মনমোহন দাঁ একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, যে প্রো-নোটে দস্তখৎ নিয়ে তিনি জনৈক অফিসারকে দু হাজার টাকা ধার দিয়েছেন, সে আফসারের অস্তিত্ব নেই। সিন্ধী বলেছিল অফিসার আত্মপরিচয় গোপন রাখতে চান; দস্তখৎ আনবার ভার তাই নিজে নিয়েছিল। মনমোহন দাঁ আরও দেখতে পেলেন ছ' হাজার টাকায় তিনি যে প্রায়-নতুন গাড়ী সিন্ধীর

মারফৎ খরিদ করেছেন ন হাজারে বেচবার নিশ্চিত আশায়, সে গাড়ীরও অস্তিত্ব নেই। অধিকন্তু, অমন সদয় বান্ধব সিন্ধী হঠাৎ বদলি হয়ে বোম্বাই চলে গেছে।

মনমোহন দাঁ ভিখারী হলেন।

সুরভি কলেজ থেকে বিদায় নিয়ে, অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর, এক রেডিয়ো-দোকানে সেলস্-গার্লের কাজ পেল। দ্বিতীয় কন্যা পূরবী, বড় হয়ে উঠেছে। ঘর কন্নার ভার পড়ল তার ওপর। স্কুলে পড়ত, এখন বাড়ীতে বই নিয়ে বসার ব্যর্থ প্রচেষ্টার সময় না পেয়ে কাঁদে। তৃতীয়া, বারো বছরের করবী, দেখে মনে হয় নয়, দিব্যি শতছিন্ন ফ্রক পরে মিষ্টির দোকানের পাশে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকে।

জীবন তো কখনও নিসর্ত পরাজয় মানে না, তাই মনমোহন দাঁ আবার কাজের খোঁজে বার হলেন।

কাজ জুটলও। দেশ-ভাগের পরে দিল্লী শহরে যে বিরাট-সংখ্যক বিদ্যা-বিপণি স্থাপিত হয়েছে, তাদের একটিতে মনমোহন দাঁ "অধ্যাপক" নিযুক্ত হলেন। ম্যাট্রিক থেকে এম-এ, কেরাণীগিরি থেকে প্রশাসনীয় প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষার চাহিদা মেটাবার বহুমুখী বিপণীতে যিনি "প্রিন্সিপাল" তাঁর আসল পেশা সেক্রেটারিয়েটে স্টেনোগ্রাফী ; বিদ্যালয়কে প্রসংশনীয় বাস্তববুদ্ধিতে তিনি ব্যবসা হিসেবে দেখেন, মুনাফা যে মন্দ নয় তার প্রমাণ ইতিমধ্যে তাঁর নিজস্ব গৃহ ও মোটর গাড়ী। ব্যবসামাত্রেই দরদস্তুর হয়ে থাকে ; অনেক দরদস্তুর করে মনমোহন দাঁ যে সর্বোত্তম ব্যবস্থা অর্জনে সমর্থ হলেন তার সরল হিসেব : যত সংখ্যক ছাত্রছাত্রী তাঁর ক্লাসে পড়বে মাথা পিছু তিনি দু টাকা পাবেন। তাঁর অধ্যাপনার বিষয় বাংলা, জায়গাটা দিল্লী, তাই কোন মাসে ষাট টাকার বেশি তিনি পান নি।

ঘর ভাড়া দিয়ে যাতায়াতের পয়সা জুগিয়ে চারটি মানুষের ভরণ-পোষণ নিজের ষাট ও বড় মেয়ের একশ কুড়ি টাকায় সংকুলান করেও মনমোহন দাঁ কবি।

॥ তিন ॥

দপ্তরে কাজ মানে যে অকাজ আপনারা জানেন। সবচেয়ে বড় অকাজ বোধহয় 'মিটিং', যা আজকাল রোজ সকাল বিকেল হয়ে থাকে, যাতে চা-কফি পান, খোশ-গল্প, তর্কাতর্কি সত্বেও কোনও সিদ্ধান্ত হয় না, অথচ যা না হলে আমাদের প্রশাসনের মহারথ অচল। মিটিং, উপরিওয়ালার মুহুর্মুহু তলব, মন্ত্রী উপমন্ত্রীর জরুরী তাগিদ, এসবের দাপটে টেবিলের ফাইল আর নড়ে না, জমে জমে পাহাড় হয়ে ওঠে।

একদিন দুটো মিটিংএ চার কাপ চা, এক প্যাকেট সিগারেট ও পর্বতপ্রমাণ বাক্যামৃত সেবনান্তে ক্লান্ত আঁখি ফাইল-পাহাড়ে নিবদ্ধ করে সম্মুখে সর্ষে ফুলের সীমাহীন মাঠ অবলোকন করছি এমন সময় সেই প্রক্ষিপ্ত হরিদ্রা ভেদ করে পণ্ডিত মহাবীর মিশ্র দৃষ্টিপথে উদিত হলেন।

যেহেতু তিনি আমায় বন্ধুত্বের সম্মান দিয়েছেন এবং রাজধানীর এমন মহত্তম বাংলো বাড়ী কম আছে যার দরজা তাঁর জন্যে উন্মুক্ত নয়, তাই, মনের অবস্থা যাই হোক, সাদরে আপ্যায়ন করতে হল। মহাবীর মিশ্র শহরের শেষতম কেচ্ছা কিছুক্ষণ পরিবেশন করলেন, দেশ-বিদেশে ভারতের অগ্র কিংবা পশ্চাৎ গতি হচ্চে তা বুঝিয়ে বললেন, চা, সিগারেট, পান গ্রহণ করলেন এবং অবশেষে তাঁর অকস্মাৎ আবির্ভাবের আসল কারণে অবতীর্ণ হলেন।

"একটা কবিতা লিখেছি, শুনবেন?"

"নিশ্চয় শুনবো।"

"চমৎকার হয়েছে। একেবারে মর্ডান কবিতা, তোমাদের আধুনিক কবিদেরও ছাড়িয়ে গেছে।"

উৎসাহিত হয়েছি, দেখাতে হল।

"এর আগে হিন্দী কাবতায় এ্যাটম বোমা, রকেট, মহাকাশ-অভিযান, কোল্ড ওয়ার, এসব মডার্ন যুগের শব্দ কেউ ব্যবহার করে।ন।"

"আপনি করেছেন বুঝি ?"

"আলবৎ। মডার্ন যুগের কবিতার জন্যে মডার্ন শব্দ চাই। মানুষ চাঁদে গিয়ে পৌঁছল, আর কবিতা এখনও হরশৃঙ্গার ফুলে শোভা বর্ণনা করবে ?"

"নিশ্চয় না।"

"আপনি বোঝেন বলেই ত আপনাকে শোনাতে আসি। যদিও আপনি কবি নন, হিন্দী ভাষায় আপনার জ্ঞান কম, তথাপি আপনি সরকারী নোকরি মিটিয়েও সাহিত্য করেন, আপনার মনে এ কবিতা নিশ্চয় দাগ কাটবে।"

"পড়ুন শুনি।"

"অবশ্য আপনি মনে করতে পারেন এ কবিতা রচনার পেছনে কোন স্বার্থ আছে। তাই বলে নি, নেই। সংস্কৃত কাব্য চিরদিন রাজার চিত্তবিনোদন করে এসেছে। হিন্দী সংস্কৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ; পিতৃপেশা একেবারে ত্যাগ করলে চলবে কেন তার ?"

ধৈর্যের সঙ্গে অধৈর্য চেপে বললাম, "পড়ুন তো এখন। কবিতা শোনবার আগ্রহ আর চাপতে পারছি না।"

খুশি হয়ে মহাবীর মিশ্র আর এক খিলি পান খেলেন। তারপর অতি যত্নে পকেট থেকে বার করলেন নীলাভ ভাঁজ করা কাগজ। সযত্নে ভাঁজ খুললেন। স্বরচিত কবিতা তাঁর যে সদাই কণ্ঠস্থ আমার খুব জানা আছে। তথাপি তিনি দলিল দাখিল করে প্রমাণ দিলেন যে কবিতা তাঁরই।

বৃষনিন্দিত সুকণ্ঠে মুদ্রিত নয়নে গভীর ভাবাবেগে যে কবিতা মহাবীর মিশ্র গান করলেন তার শিরোনামা "শান্তি-দূত।"

কবিতাটি ভারত-অতিথি মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের বন্দনা। বলতে ভুলে গেছি তার আগের দিনই আইসেনহাওয়ার দিল্লীর ধূলোয় পাদুকা ধূসর করেছেন।

হিন্দীতে আমার দখল যৎসামান্য, তাই সে বন্দনাগীতির সবটা

নিবেদন সম্ভব নয়। তবে বহু বিশেষণ, উপমা অলংকার অনুপ্রাস ইত্যাদির মুক্তহস্ত ব্যবহারে মহাবীর মিশ্র যা তৈরী করেছেন তা পাঠ করলে আইসেনহাওয়ার কেন স্বয়ং শনিঠাকুরও যে সন্তুষ্ট হবেন তাতে কোনও সন্দেহ রইল না। হিন্দীকবিতা-সঙ্গীতের উত্থান-পতনের সঙ্গে শ্রোতার সোৎসাহ সরব বাহবাপ্রদান বাধ্যতামূলক। বাহবা দিতে দিতে পুলকিতচিত্তে আমি শুনতে পেলাম কবি গোদাবরী মিশ্র মার্কিন রাষ্ট্রপতিকে বারংবার শান্তি-দূত বলেছেন, বলেছেন মার্কিন দেশ চিরদিন পৃথিবীর পদদলিত মানুষের মুক্তি কামনা করেছে। আণবিক শক্তিকে শান্তির সেবায় কায়মনোবাক্যে বিনিযুক্ত করেছে। পৃথিবীর মানুষের পরম সৌভাগ্য যে অমন প্রবল পরাক্রান্ত অথচ যুদ্ধে বীতরাগ নেতা পেয়েছে, মার্কিন মহাকাশ-অভিযান অচিরে চন্দ্রলোক অধিকার করে মনুষ্যজাতির কল্যাণসাধনে চন্দ্রমাতুলকে নিযুক্ত করবে সে বিষয়ে ভারতের অধমাধম কবি কালিদাসস্থ উত্তরসূরী পণ্ডিত মহাবীর মিশ্রের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

পাঠ সমাপ্ত হলে কবি সামান্যক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হয়ে তার পূর্ণ রসাস্বাদন করলেন। তারপর মুদিত আঁখি ঈষৎ উন্মীলিত করে মৃদু কণ্ঠে শুধালেন, "কেমন লাগল ?"

"চমৎকার। আপনি যে কালিদাসকেও হার মানিয়েছেন।"

"না, না, অতটা নয়। কোথায় কালিদাস, কোথায় আমি ! তবে আপনাদের রবীন্দ্রনাথের 'ভারত ঈশ্বর শাজাহানে'র পরে বোধকরি খুব খারাপ হয় নি।"

"কিছুতেই না। কোন শালা বলবে খারাপ হয়েছে ?"

"তা হলে চলবে ?"

"নিশ্চয় চলবে। আজই দিন পাঠিয়ে।"

ঈষৎ হাসলেন মহাবীর মিশ্র। "ধরে ফেলেছেন, দেখছি।" গলার স্বর নামিয়ে, "পাঠিয়ে দিয়েছি।"

"এরই মধ্যে ? বেশ করেছেন। এবার তৈরী হোন।"

"কেন ? কিসের জন্যে ?"

"নিমন্ত্রণ এলো বলে। আপনার তো অনেকদিন আমেরিকা যাবার ইচ্ছে। এবার ভাবীকে বলুন বাক্স গুছিয়ে দিক।"

হাসলেন মহাবীর মিশ্র। "আপনার মনে হয়—"

"নিশ্চয়। আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।"

"শুনেছি, ওরা কবিতা-টবিতার বিশেষ ধার ধারে না।"

"ওরা ধার-ধারুক না ধারুক আপনার কবিতা ধারে কাটবে।"

"দেখুন তো ! আপনি সমঝদার মানুষ, কেমন সুন্দর বোঝেন ! এক হিন্দী লেখককে পড়ে শোনালাম, বলে কিনা, এতো কবিতা নয়, স্তুতি !"

"বললো বুঝি ?"

"ওরা কি কবিতার কিছু বোঝে ? কবিতা মানেই স্তুতি ! হয় রাজার, নয় দেবতার, নয় প্রকৃতির বা প্রিয়ার।"

"নিশ্চয়। তাহলে আইসেনহাওয়ারের কেন নয় ?"

"আমিও তাই বলি। দেখুন, কখন যে কিসে কি হয়ে যায় বলা কঠিন। আপনি তুলসীদাসের ব্যাপারটা জানেন ?"

"সেই যিনি রামচরিতমানস লিখেছিলেন ?"

"আরে না, না। তুলসীদাস, যে কেরাণী ছিল, এখন অফিসার !"

"না তো।"

"তুলসীদাস কেরাণী হলে কি হবে, আসলে চতুর কবি। একবার ওর প্রদেশে এক মন্ত্রীর জন্মদিনে তুলসীদাসের কবিতা পাঠের সৌভাগ্য হল। দশটি স্তবকে তুলসীদাস মন্ত্রী-জীবন পরিক্রমা করলেন। প্রত্যেক স্তবকের শেষ পংক্তিতে আনলেন নিজের জীবনের হতাশার আর্তনাদ। "হে মহানুভব, মিউনিসিপ্যালিটির কাউন্সিলার থেকে তুমি চেয়ারম্যানের পদে উন্নীত হলে, শহরের লোকেদের সৌভাগ্য তারা তোমাকে পৌরপতিরূপে পেল, শহরের অনেক মানুষের অনেক মঙ্গল তুমি করলে ; কিন্তু হায় নিষ্ঠুর বিধাতা, তুলসীদাস যে-কেরাণী ছিল, তাই রয়ে গেল।"

আমি পুলকে শিহরিত হলাম। চেঁচিয়ে উঠলাম, "তাই নাকি, এ-ও সম্ভব।"

তিনি বলে চললেন, "তারপর একদিন আরও সুমহান কর্তব্য তোমায় আহ্বান করল। স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি বৃহত্তম প্রদেশের অন্যতম কর্ণধার তুমি হলে। প্রদেশের সৌভাগ্য খুলে গেল, চতুর্দিকে তার চমকিত প্রসার, বৈভব ; কিন্তু হায়, নিষ্ঠুর বিধাতা, তুলসীদাস যে-কেরাণী ছিল, তাই রয়ে গেল।"

"আমাদের রবি ঠাকুরের বিষয়-বুদ্ধি ছিল না। কবিতা শুনে রাজা রাজভাণ্ডারের সবকিছু দিতে চাইলেন, কিন্তু নির্বোধ কবি শুধু চাইলো, 'কণ্ঠ হইতে দেহো মোর গলে, ওই ফুলমালাখানি।'"

"এজন্যেই তো মাড়োয়ারীরা আপনাদের রাজভাণ্ডার দখল করে বসেছে, আপনারা ফুলের মালা গলায় পরে আনন্দে নির্বাণ-সুখ লাভ করছেন।"

"যা বলেছেন। বঙ্গদেশে এখনও শুনেছি কবিতা বেশ পয়দা হয়। কবিদের উচিত কাব্য-যন্ত্রকে জীবনের হলকর্ষণে নিযুক্ত করা। ভালো আবাদ করলে সোণা ফলতেও বা পারে। কি বলেন?"

মহাবীর মিশ্র উত্তেজিত হলেন, "দেখুন, বাঙালী বাবু, মস্করা ছাড়ুন। স্বাধীন ভারতবর্ষে ক'জন সাহিত্যিক-কবি-নাট্যকার আছেন যাঁরা সরকারী দাক্ষিণ্যের জন্য হাত পাতেন না?"

"আমি তো মনে করি, অনেক।"

"ছো, ছো। খোঁজ নিয়ে দেখুন। সরকারী দাক্ষিণ্য হাজার পথে প্রবাহিত। তার পবিত্রবারিতে কমবেশি পরিতৃপ্ত নন, এমন সাহিত্য-কর্মীর সংখ্যা হাতের পাঁচ আঙুলে গোণা যায়।"

"কী সর্বনাশ! তাহলে আপনাদের বুদ্ধি ও চেতনার স্বাধীনতা বাঁচবে কি করে?"

"বাঃ বাঃ, আপনার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়। যতোদিন দেশ পরাধীন ছিল, সাহিত্যিকের বুদ্ধি ও চেতনার স্বাধীনতা দরকার

ছিল। এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে, ওসব সেকেলে তত্ত্ব এখন অচল।"

"বুঝলাম। দেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকারের স্বাধীনতার আর প্রয়োজন নেই।"

"এবার বুঝেছেন।"

"সরকার যখন স্বাধীন, দেশের স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব যখন তার, তখন কবি সাহিত্যিক সবার কর্তব্য বুদ্ধি ও চেতনা সরকারে সমাপ্ত করা।"

"নিশ্চয়। তা নইলে ইমোশনাল ইনটিগ্রেসন হবে কি করে?"

"বুদ্ধি এবার একটু খুলছে।"

"চিন্তা করুন, আরও খুলবে। কবি বা লেখক যদি দেশব্যাপী গঠন-প্রচেষ্টার অর্থকরী বৈভবের অংশীদার না হতে পারে, তার বেঁচে থেকে লাভ কি?"

"কিচ্ছু না! মৃত্যুই তার শ্রেয়।"

"তাই বলুন। আজ কবির কর্তব্য দেশবাসীকে জাগিয়ে তোলা, তাকে দেশনির্মাণে উদ্বুদ্ধ করা। সুতরাং সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকে চলতে হবে।"

"হবেই তো।"

"আমার ক্ষুদ্র কাব্য-শক্তিতে আমি তাই করতে চাইছি।"

"আপনার শক্তি ক্ষুদ্র নয়, মিশ্রজি। আপনারা রাজভাষার কবি। যেদিকে চলবেন, সমস্ত দেশ আপনাদের অনুসরণ করবে। মনে করুন গীতার সেই বাণী 'যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ'!"

প্রীত হলেন মহাবীর মিশ্র।

"তা কি আর বুঝি না? এককালে বাঙালী কবি পথ দেখিয়েছে, আমরা চলেছি। আপনাদের দেখাদেখি আমরাও প্রকৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছি, প্রেম নিয়ে, বিরহ বেদনা মিলন নিয়ে। এখন জমানা বদলেছে। এখন হিন্দী জাতীয় ভাষা, হিন্দী কবি জাতীয়

কবি। আমাদের এবার পথ দেখাবার পালা। প্রত্যেকটি শ্লোক রচনা করবার সময় এই কঠিন দায়িত্ববোধ আমাকে বারম্বার সতর্ক করে।"

"করবেই তো। আমাদের রবিঠাকুর আপনাদেরই বোধ হয় আহ্বান করে গিয়েছেন। 'সে কবির বাণী-লাগি কান পেতে আছি'।"

"শুনতে পাবেন, শুনতে পাবেন। এই তো এখুনি শুনলেন। কেমন লাগলো ?"

"চমৎকার। 'মুহূর্তাদেব চাপশ্যৎ পুরুষং রক্তবাসসম...'। 'মুহূর্তকাল পরে সাবিত্রী দেখলেন, এক রক্ত-বসনধারী বিশালবপু সূর্যসম তেজস্বী ভয়ংকর পুরুষ...'।"

"যম ?" চেঁচিয়ে উঠলেন মহাবীর মিশ্র।

"চটবেন না। যম-কবিরই আজ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। যে মারতে পারে, সংহার করতে পারে, সবকিছু হরণ করতে পারে। জীবন-কবির দিন শেষ হয়েছে।"

॥ চার ॥

বেশ ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটছিল। পাঠকদের মধ্যে যাঁরা পার্কিনসন সাহেবের প্রশাসন-দর্শন পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন সরকারী দপ্তরে কর্মবৃদ্ধির কতগুলি স্বতঃসিদ্ধ প্রণালী আছে। আমরাও অমন একটা প্রণালীর পথ বেয়ে জটিল কোন এক সমস্যার সৃষ্টি করে তার মধ্যে সানন্দে হাবুডুবু খাচ্ছিলাম। প্রশাসন-বিজ্ঞানের নিয়ম সমস্যাকে জটিলতর করা; কোন কিছু সহজে সমাধান করতে না চাও, কমিটি বসাও, কমিটির কাজ সহজ করতে চাও, গোটাকয়েক সাব-কমিটি তৈরী করো; সমস্যার ওপর এমন এক মহাসৌধ গড়ে উঠবে যার নীচে আসল সমস্যাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাতে দেশের মঙ্গল হবে, কিছু বড় মানুষের আত্মীয়-উমেদাররা কাজ পাবেন, কয়েকজন অফিসারের অন্তত সাময়িক পদোন্নতি ও বেতনবৃদ্ধি হবে,

আর এক ওয়াগন ফাইল তৈরী হবে। এমনই একটা সমস্যা-কমিটি-সাবকমিটি-মেমোরাণ্ডা-রিপোর্ট জড়িত দুর্ঘটনায় ফেঁসে গিয়ে দেশসেবার ভয়ঙ্কর চাপে নিষ্পেষিত হবার নৈসর্গিক আনন্দ উপভোগ করতে করতে মেজাজ-মন তিরিক্ষে হয়ে আছে, এমন সময় বেয়ারা এসে এক-টুকরো কাগজ টেবিলে স্থাপন করলো।

জনৈক দর্শনপ্রার্থীর প্রবেশ প্রার্থনা।

ফাইলে মুখ রেখে টুকরো নজরে দেখলাম, "মনমোহন দা।"

ভদ্রলোক আর সময় পেলেন না! আমরা ব্যস্ততার সময় উপরিওয়ালাদের কাছে ধমক ভ্রূকুটি-বিদ্রূপ বেশি পাই, অধস্তনদের ওপর সেটা সুদে-আসলে আদায় করে নি; মরার সময় না থাকলেও কর্তাদের ডাক এলে তৈরী চা-য়ে চুমুক না দিয়ে ছুট দি, মুরুব্বিবিহীন দর্শনপ্রার্থীদের হয় ঘণ্টাখানেক বসিয়ে রাখি, নয় তো দর্শন দি' না। এই সুসঙ্গত, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ নিয়মে আমরা এমন পুতুল-চালিত যে, সামান্যতম মানসিক প্রয়াস অপব্যয় না ক'রে বেয়ারাকে বলে দিলাম, "আজ দেখা হবে না, দিন দশেক পরে আসতে বলে দাও।"

বেয়ারা দরজা পর্যন্ত পৌঁছতে আমার মন নামক অর্ধ-সুপ্ত পদার্থটা হঠাৎ জেগে উঠলো। বলল, বেচারা দরিদ্র, অসহায়, দুর্বল বলেই না এমন সুভদ্র ব্যবহার সম্ভব। এসেছে পুরনো শহর থেকে, গ্রীষ্ম-দুপুরের রোদ মাথায় ক'রে, অতি কষ্টার্জিত পয়সা খরচ করে। এসেছে নিশ্চয় বিপন্ন হয়ে। একে দশ দিন পরে আসতে বলাও যা, একেবারে চিরদিনের জন্যে আসতে বারণ ক'রে দেওয়াও তা।

বেয়ারাকে ডেকে বললাম, "নিয়ে এসো।"

সংকোচ আনত দেহ নিয়ে মনমোহন দা ঘরে ঢুকলেন।

"আসুন মনমোহনবাবু। বসুন।"

মুখে কথা সরছে না। শীর্ণদেহ আবৃত করেছে কলারে, আস্তিনে, কাঁধে ছেঁড়া আধ ময়লা সার্ট, তারও চেয়ে একধাপ বেশি ময়লা খাকি প্যাণ্ট। রৌদ্রে দেহ পুড়ে গেছে, চোখে ঝলসানো ক্লান্তি।

কষ্টে একটু হাসবার চেষ্টা করলেন। দম নিয়ে বললেন, "এক গ্লাস জল।"

বেয়ারা জল আনলো। ঢক-ঢক ক'রে এক নিশ্বাসে পান করলেন মনমোহন দাঁ।

"তা কি খবর? কেমন আছেন আজকাল?"

"দিন কাটছে", বিষণ্ণ হাসি মনমোহন দাঁর সামান্য সজীবতর মুখে।

"কাটলেই হল। বাড়ীর সব ভালো?"

"তেমন ভালো আর কোথায়? ছোট মেয়েটার জন্‌ডিস।"

"বলেন কি? চিকিৎসা হচ্ছে তো?"

"হচ্ছে।"

"কে দেখছেন?"

"আমিই দেখছি।"

"হোমিওপ্যাথি?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। অনেকটা সেরে উঠেছে।"

"বড় মেয়ের চাকরি ভালো চলছে তো?"

"ভালই চলছে। তবে—" একটু ইতস্তত করে, "তবে সে চলে গেছে।"

"তার মানে?" রীতিমত অবাক হলাম।

"এক হিন্দুস্থানী ছোকরাকে বিয়ে করেছে।"

"তাই নাকি? কবে হ'ল এ ব্যাপার?"

"আজ তেইশ দিন।"

"কেমন ছেলেটি?"

"ভালোই।"

"কি করে?"

"রেডিয়ো সারায়।"

"একই দোকানে?"

"একই।"

"আপনি বুঝি বিয়েতে মত দেন নি!"

"মতের প্রশ্ন ওঠে নি।"

"মনে হচ্ছে আপনি খুশী হন নি।"

দার্শনিক হাসি ফুটে উঠল মনমোহন দাঁর হাড়ল মুখে। গোঁফের ঝোপে পরক্ষণে মিলিয়ে গেল।

"খুশী হয়েছি। যে বাপ মেয়ের বিয়ে দিতে পারে না, মেয়ে নিজে থেকে বিয়ে করলে তার খুশী হওয়া উচিত।"

"নিশ্চয়।"

মনমোহন দাঁ আর এক গ্লাস জল খেলেন।

এর মধ্যে বার চারেক টেলিফোন এলো। কথার ব্যবধানে তাকিয়ে দেখি, মনমোহন দাঁ ঢুলছেন। রৌদ্রতপ্ত দেহে যন্ত্র-নির্মিত ঠাণ্ডা লেগে নিদ্রা পাচ্ছে।

কেমন একটু সন্দেহ হল।

জিজ্ঞেস করলাম, "চা খাবেন?"

সংকুচিত জবাব এলো তন্দ্রা-কাটা চমকিত সুরে: "তা একটু খেতে পারি।"

"আর কিছু?"

"আজ্ঞে না"

বেয়ারাকে চা টোস্ট ও একটা ডিমের জন্য পাঠিয়ে দিলাম।

"দেখুন, দাঁ-মশাই, এই যে বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী বিয়ে, এর প্রয়োজন যেমন বেড়েছে, ফলাফলও তেমনি শুভ। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ হল সমস্ত ভারতবর্ষে মিলিয়ে যাওয়া।"

"মিলিয়ে তো আমরা যাচ্ছিই।"

"ঐ তো আপনাদের দোষ। বাঙ্গালীপনা কিছুতেই আপনারা ছাড়বেন না। কিন্তু যা-ই বলুন, বাঙ্গালীপনা আর আমাদের বাঁচিয়ে রাখবে না।"

"তা তো দেখতেই পাচ্ছি।"

"সুতরাং বিয়ে-শাদি দ্বারা অবাঙ্গালীর সঙ্গে আত্মীয়তার সেতু-নির্মাণ আজ অবশ্য কর্তব্য। সে দিক থেকে আপনার মেয়ে যা করেছে তা ভালো, দরকার, যুক্তি ও বুদ্ধিসঙ্গত।"

কি একটা মনমোহন দাঁ বলতে যাচ্ছিলেন, আবার টেলিফোন বেজে উঠলো।

রিসিভার নামিয়ে শুধালাম, "কি বলছিলেন ?"

"কিছু না।"

"জামাই আসে যায় তো ? মেয়েকে এনে রেখেছিলেন ?"

"দুজনেই আসে। এ মাসেও মেয়ে সংসার চালাবার টাকা দিয়েছে।"

"আহা, দেখুন তো! মেয়েরা সত্যি আজকাল বড় ভালো।"

"কিন্তু আর দিতে বারন করেছি।"

"কেন ?"

"বিবাহিতা কন্যার অর্থ নেওয়া উচিত নয়। তা ছাড়া, ওদেরও তো চলা চাই।"

"আপনার চলবে কি করে ?"

"চলে যাবে।"

বেয়ারা খাবার আনতে মনমোহন দাঁ-র চোখ চকচক ক'রে উঠলো।

"কলেজে চাকুরী তো আছে!"

"তা আছে।"

"কিছু সুবিধে হল মাইনের দিক থেকে ?"

"দুর্বলের কোন সুবিধে হয় না।"

"অন্য কিছু চেষ্টা করছেন ?"

"খোঁজ খবর দু-একটা করি, কিন্তু লাভ নেই; কোথাও সুবিধে হয় না।"

একটু চুপ থেকে আবার বললেন, "একটা কাজ পেয়েছিলাম, মাইনেও মন্দ ছিল না।"

"কি কাজ ?"

"এক পাঞ্জাবী কনট্রাক্টারের হিসেব লেখা।"

"নিলেন না কেন ?"

"নিয়েছিলাম। রাখতে পারলাম না।"

"কি হল ?"

"দু কিস্তি খাতা লিখতে বললো। একটা সত্যি হিসেব, একটা মিথ্যে হিসেব।"

"বাঃ, এ যে জীবনের হিসেব!"

"মিথ্যে হিসেব দিয়ে সরকারকে ঠকাবে।"

"সরকারকে কে-না ঠকায় ?"

"আমার দ্বারা হল না।"

"কেন ?"

"সারা জীবনটাই মিথ্যে হিসেব হ'য়ে গেল, এখন এই বুড়ো বয়সে মিথ্যে হিসেবের খাতা লেখায় মন রাজী হল না।"

কি বলবো বুঝলাম না। চতুর্দিকে ফ্যাকাশে ধূসর রং-এর ফাইল গুলি হি হি ক'রে হেসে উঠলো। হেসে হেসে লুটোপুটি খেয়ে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, সত্যমেব জয়তে।

আধ ঘণ্টা কেটে গেল। আর সময়ের অপচয় করা যায় না। এর মধ্যে দশ-বারোটা নতুন ফাইল এসে টেবিলে জমেছে। তারাও হাসছে।

বললাম, "এবার একটু কাজে বসবো। কোনও বিশেষ দরকার ছিল আপনার ?"

"একটু ছিল।"

"বলে ফেলুন এবার।"

"দ্বিতীয় মেয়েটা—"

"কি হল তার ?"

"দিন রাত কাঁদে।"

"কেন ?"

"স্কুলে পড়বে।"

"মাইনে কতো ?"

"তা, মাইনে, বাস, বই সব নিয়ে ত্রিশ টাকা তো লাগবেই।"

"আমি কি করতে পারি ?"

"শুনছি গরীব ছাত্রছাত্রীদের জন্যে অনেকগুলি বৃত্তির ব্যবস্থা হয়েছে।"

"দরখাস্ত দিয়েছেন ?"

"হ্যাঁ। অযোধ্যাপ্রসাদ নিগমের হাতেই সব।"

"আচ্ছা, আমি বলে দেব।"

"আপনি বললে হয়ে যাবে। আপনার সঙ্গে তো অনেক দিনের আলাপ।"

"আপনি ওর নাম, স্কুলের নাম সব লিখে রেখে যান।"

লিখেই এনেছিলেন। পকেট থেকে টুকরো কাগজ বার ক'রে আমার হাতে দিলেন।

বললাম, "খুব একটা অসুবিধে না থাকলে বোধ করি হয়ে যাবে।"

"কবে এসে খবর নেব ?"

"আমি কালই বলবো। একদিন এসে জেনে যাবেন।"

কথা ও হাবভাবে সাক্ষাৎকারের সমাপ্তি ঘোষণা করলাম। কিন্তু মনমোহন দাঁ উঠি-উঠি ক'রেও উঠলেন না।

"আর কিছু ?"

মুখখানা কাঁচুমাচু ক'রে মিহি সুরে বললেন, "একটা জিনিস আপনাকে পড়তে দেব। সময়মত পড়ে নেবেন। ছোট্ট জিনিস। দু-দশ মিনিটের বেশী লাগবে না।"

"আপনার লেখা ? বুঝতে পেরেছি। বেশ তো। রেখে যান।"

"লেখা নয়।"

"তবে ?"

"কবিতা।"

"ক-বি-তা ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

"এতো সবের মধ্যেও আপনি কবিতা লেখেন ?"

"কখন সখন।"

"আসে ?"

"ডাকতে পারলে আসে।"

"পারেন ?"

"একেবারে না ডেকে পারি নে।"

"দিন। নিশ্চয় পড়বো।"

"কাউকে দেখাতে লজ্জা করে। পত্রিকায় পাঠাতেও।"

"কেন ? দু-একটা তো ছেপেছে আপনার কবিতা।"

"তা ছেপেছে।"

"তা হলে ?"

"আর দরকার নেই। অনেক কবিতা লিখেছি। একজন বড় ভালবাসতেন। মরার সময় মনুষ্যজাতির জন্য রেখে যাব।" করুণ হাসির সঙ্গে নম্র বিদ্রূপ বেজে উঠলো।

"পড়বো। এর পরের দিন যখন আসবেন, দিয়ে দেব।"

জামার নীচে ফতুয়ার পকেট থেকে ভাঁজ করা কবিতা সংকুচিত হাতে বার করে মনমোহন দা আমায় দিলেন। দিতে গিয়ে হাত কাঁপল। বুঝি মনও কাঁপল।

আমি দৃঢ় যত্নে কবিতার ওপর পাথর চাপা দিলাম।

মনমোহন দা দরজার দিকে অগ্রসর হলেন। যেন অনেক কষ্টে পা দুটো টেনে নিয়ে নিক্রান্ত হলেন। যাবার আগে মুখ ফিরিয়ে বললেন :

"আমার জন্যে আপনি অনেক করেছেন।"

"ও আবার কি কথা ?"

"দেবার কিছু নেই আমার।"

"থামুন। আচ্ছা, আবার আসবেন।"

রহস্যময় এক টুকরো হাসি গুম্ফ-ঝোপে ঝিলিক মারল।

॥ পাঁচ ॥

আর আসেননি মনমোহন দাঁ।

মেয়ের জন্য ব্যবস্থা অযোধ্যাপ্রসাদ ক'রে দিয়েছিল। ক্লাবে সে হামেশা আমার পান-সন্ধ্যার অতিথি। তুটো অতিরিক্ত সোডা ও স্কচের তাপে বন্ধুত্বকে উষ্ণ করে প্রস্তাব পাড়তে সে রাজী হয়েছিল সহজেই।

কিন্তু মনমোহন দাঁ রেহাই পেয়ে গেলেন। রোদ্দুরে পথ চলতে গিয়ে রাস্তায় জ্ঞানহীন দেহ তাঁর মুখ থুবড়ে পড়লো। হাসপাতালে পরের দিন মৃত্যু হল। ভাগ্যিস অমন ঘটনাময় মৃত্যু, তাই খবরের কাগজে পর্যন্ত নাম ছাপা হল। হীট্ স্ট্রোকে স্থানীয় কলেজের জনৈক "অধ্যাপক" মনমোহন দাঁ পরলোকগমন করলেন। পুলিশের কাছে, সৌভাগ্যক্রমে, তাঁর কবি পরিচয় অজ্ঞাত ছিল, তাই রিপোর্টারেরা গন্ধ পেল না।

বলা বাহুল্য, মনমোহন দাঁ-র তিন কন্যার খোঁজ আমি করি নি। মনুষ্যজাতির জন্যে যে বিপুল কবিতারাশি তিনি রেখে গেলেন তা নিয়েও আমার মাথাব্যথা হয় নি! অনুমান করি, রাজধানীর কোনও মুদি সেগুলোর উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করে থাকবে।

যে কবিতাটি আমায় তিনি পড়তে দিয়ে আর ফেরত নেন নি, তার বিরাট বোঝা আমাকে কাবু করলো। ফেলে দিতে গিয়ে বার বার মনে হলো মনুষ্যজাতির সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবে আমার হাতে নিকষিত হেমের যে নমুনাটুকু দিয়ে গেছেন তাকে নির্দয় বিসর্জন দেবার অধিকার কি আমার আছে?

কবিতাটি কিছু নয়। পয়ার ছন্দে কাঁচা হাতের কসরত। তবু কান পাতলে তার মধ্যে ট্রাজেডির সুর বাজে। জীর্ণ জীবনের ছবি

আঁকতে চেষ্টা করেছিলেন মনমোহন দাঁ। ছবি হয় নি, কাঁচা রং-এর এলোমেলো দাগ পড়েছে মাত্র, তবু এখানে ওখানে বেদনার অব্যক্ত মূর্ছনা। জীবনে মনমোহন দাঁ ব্যথা পেয়েছেন অনেক, বিপদের ঝুঁকি বার বার ঘাড়ে নিয়েছেন, পত্নীর মৃত্যুর পর থেকে জীবন থেকে আনন্দ পান নি, কেবল দায়িত্বের নির্মম বোঝা ব'য়ে বেড়িয়েছেন। মানুষ তাঁকে চরম প্রতারণা করেছে। বিদ্যার আদর পান নি, সমাজে সম্মান জোটে নি। তাঁর জীর্ণ-শীর্ণ দেহে প্রতিবাদ জমাট হয়ে ছিল, নালিশ মূক। মুখে কোনও দিন কারুর নিন্দা তাঁকে করতে শুনি নি, উত্তেজিত হতে দেখি নি। কোনও একটা গুপ্ত ঐশ্চর্যের সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন, যা তাকে নীবব রেখেছে, শান্ত।

সে ঐশ্চর্য কি তাঁর কবিতা?

যে মানবিক উত্তরাধিকার টেবিলের ড্রয়ারে নিঃশব্দে মহাকালের প্রতীক্ষায় অনাদরে নির্বাসিত, তার কয়েকটি পংক্তি ঘুরে ঘুরে আজও আমার মনে ভেসে ওঠে, ফাইল ঘেরা নকল-জমক আত্ম-সম্মোহক অস্তিত্বের পরিপাটি পরিধিতে নিয়ে আসে ক্ষনিক অস্বস্তিকর আপীড়ন।

জীবনটাকে যত ক্ষুদ্র মনে হয়
জীবনটা তত ক্ষুদ্র কিন্তু নয়॥
দম-বন্ধ-করা অন্ধকার ঘর
একবেলা সামান্য আহার।
কন্যাদের শুষ্ক ক্লিষ্ট মুখগুলি
যেন নিষ্ঠুর বন্দুকের গুলি॥
এত ব্যথা, তবু জীবন ক্ষুদ্র নয়
জীবন বড় রহস্যময়॥

বিদ্রোহী

দেরী ক'রে ওঠা অভ্যেস বালকৃষ্ণ আহুজার, কিন্তু আজ সাত সকালে ঘুম ভাঙল, চট ক'রে উঠে প'ড়ে বারান্দায় চ'লে এলেন। শোবার ঘর থেকে বেরোবার সময় দেখলেন, ধর্মপত্নী কমলা আহুজা তখনও সুনিদ্রিত; সামান্য হাঁ-করা মুখে, প্রসাধনের অভাবে তাঁর প্রকৃত বয়সের স্বাভাবিক পরিচয় প্রকাশিত। সামান্য কৌতুক অনুভব করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা: নিজের এ মুখচ্ছবি ভাগ্যিস কমলা দেখতে পান না! পেলে দ্বিতীয়বার ফেস্-লিফ্টের জন্য আর একরাশ টাকা বেরিয়ে যেত।

বারান্দায় এসে দেখলেন সবে প্রভাত হয়েছে, কাগজ আসবার সময় হয় নি। চোখে ঘুম লেগে রয়েছে, ভাবলেন, এখনও ঘণ্টাখানেক শোওয়া যায়। কিন্তু বুঝতে পারলেন, মন এমন অস্থির যে ঘুম আর আসবে না। বাংলো-বাড়ীর চতুর্দিকে প্রশস্ত তৃণভূমি; ডান দিকের লন্‌টাকে বালকৃষ্ণ বিশেষ যত্ন ক'রে সবুজ ও নরম রেখেছেন; ওখানে পামগাছের নীচে সন্ধ্যাবেলা চেয়ার পেতে বন্ধুবান্ধবীদের নিয়ে তাঁরা কখনো-সখোনে বসেন, গালগল্প করেন। কাল সন্ধ্যায় পাতা আরাম কুরশি এখনো গাছতলায় রয়েছে; বালকৃষ্ণ আহুজা এগিয়ে গিয়ে তাতে বসলেন। সকালটা চমৎকার সুন্দর। সামান্য শীত পড়েছে, ঝির ঝির প্রভাতী হাওয়া। আকাশ আশ্চর্যরকম শান্ত, বিস্তৃত নীলের বুকে হালকা শাদা মেঘ। রাজকার্য সমাপ্ত ক'রে বালকৃষ্ণ আহুজা যখন বাড়ী ফেরেন রোজ, তখন রজনীর প্রথম প্রহর; মাঝে মধ্যে, একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পত্নী কমলাকে নিয়ে পার্টিতে, ক্লাবে যেতে হয়। রোজ অনেক রাত্রি পর্যন্ত পুনরায় দেশসেবায় মনোনিবেশ করেন; যখন শুতে যান, মধ্যরজনী অতিক্রান্ত; ঘুম ভাঙলে প্রভাত অনেকক্ষণ

উত্তীর্ণ, রোদ বেশ একটু উত্তপ্ত। ঊষাকালীন প্রকৃতির এই নীরব শান্ত কোমল সৌন্দর্য অনেকদিন চোখে পড়ে নি, মনে লাগে নি। হলদে, ফ্যাকাশে কাগজের ফাইল দেখতে দেখতে দৃষ্টি কেমন ঝিমিয়ে এসেছে।

ড্রেসিং গাউনের পকেট থেকে সিগারেট কেস বার ক'রে ধূমপানে প্রবৃত্ত হলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। মনে একটা চাপা উত্তেজনা, অস্থির আনন্দ। প্রভাতী প্রকৃতির পানে সতৃপ্ত নয়নে বার বার তাকালেন! মনে যেন কী একটা সুর গুঞ্জন ক'রে উঠল। গানের সুর নয়, বালকৃষ্ণ আহুজা টের পেলেন, আনন্দের সুর। নিয়মের বাইরে জীবনকে প্রতিষ্ঠা দেওয়ার আনন্দে মন তাঁর শান্ত উষার হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঁপল। এই যে এমন প্রথম প্রভাতে পামগাছের নীচে আরাম কুরশিতে দেহ এলিয়ে তিনি হেমন্তের সৌন্দর্য উপভোগ করছেন, এর মধ্যেও বে-নিয়মের আনন্দ।

বালকৃষ্ণ আহুজার মত মানুষদের দিনগুলি সকাল থেকে রাত পর্যন্ত প্রয়োজনের শৃঙ্খলে বন্দী। কৃপন বিধাতা একটি দিনকে মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আয়ু দিয়েছেন; কেমন ক'রে কোথায় যে সে নিঃশেষ হয়ে যায় বালকৃষ্ণ যেন জানতেই পারেন না। দিন কেন, বছর পর্যন্ত কী ভয়ানক স্বল্পায়ু! পরাধীন ভারতবর্ষে কিন্তু এমন মনে হত না। দিনগুলি দীর্ঘ ছিল, বছর দীর্ঘায়ু। অবসর ছিল অনন্ত, তাড়াহুড়ো কম। স্বাধীন হবার পর ভারতবর্ষ চলেছে ত না, ছুটছে। যেমন অস্থিরচিত্ত, তেমনি দ্রুতগতি। ফলে বালকৃষ্ণ আহুজাদের দিন গেছে, রাত গেছে, বছর গেছে। সব নমো রাষ্ট্রদেবায়। নিজের বলতে কিছু যে নেই বাকী।

সারাটা জীবন পরম নিষ্ঠার সঙ্গে রাষ্ট্রসেবা করেছেন বালকৃষ্ণ অহুজা। এখন বিদায়ের মুহূর্ত সমাগত প্রায়। অথচ অন্তরে কেন যেন তৃপ্তি নেই, যেন ক্ষোভের গুরুভার। সার্থকতা নামক মুকুট মাথায় বসেছে, কিন্তু অন্তরে তার কোন ছটা লাগে নি। আমি অনেক বড় হয়েছি ভাবতে অহংকার হয়, কিন্তু তেমন যেন আনন্দ হয় না।

আজকের এই নতুন সকালে অবশ্য বালকৃষ্ণ আহুজার মনে অন্য

ভাবনা। এ দিন যদি সাধারণ দিন হত, দপ্তর থেকে বয়ে-আনা ফাইল নিয়ে বসতেন। আজ কেমন একটা বিদ্রোহের নেশা মনে লেগেছে। ভাবছেন, এক্ষুণি, আজ সকালে, আমার নতুন পরিচয় মানুষ পাবে। তারা জানবে না, চিনবে না নতুন আমাকে। চুয়ান্ন বছরের একটানা রাষ্ট্রসেবার পুরষ্কার যে বালকৃষ্ণ আহুজা, তার আপাত-স্তিমিত আত্মা থেকে যে বিদ্রোহীর জন্ম হল, তার পরিচয় পাবে না কেউ। শুধু জানব আমি আর বিধাতা।

সচকিত বালকৃষ্ণ ফটকের বাইরে জীর্ণ সাইকেলের কর্কশ আওয়াজ শুনলেন। বড় বড় পা ফেলে গেলেন এগিয়ে।

যে লোকটা সাইকেল থেকে নেমে ফটক খুলে ভেতরে এল, এর আগে কোনওদিন সাহেবের চেহারা তার চোখে পড়ে নি। বিস্মিত সম্ভ্রমে সে থামল, আনত হয়ে সম্মান জানাল; প্রভাতী সংবাদপত্র এগিয়ে দিল। হাতের মৃদু ইসারায় বালকৃষ্ণ তাকে দাঁড়াতে বললেন। বুকের মধ্যে কেমন একটা আলোড়ন; বড় নিঃশ্বাস নিলেন। ঝট ক'রে কাগজের মধ্যবর্তী পৃষ্ঠা খুললেন। চোখ মুখ উদ্ভাসিত হল। দেখতে পেলেন, সম্পাদকীয় পৃষ্ঠায় চার-কলম শিরোনামা নিয়ে মুদ্রিত সেই বিদ্রোহের ইস্তাহার। নীচে কালো হরফে রচয়িতার ছদ্মনাম 'ইউলিসিস্ ওল্ড'। লম্বা সরু মসৃণ অক্ষরগুলি অপার বিস্ময়ের দুর্বার আকর্ষণ। বালকৃষ্ণ আহুজা চোখ তুলতে পারলেন না। খস্‌খস্ জুতোর আওয়াজ শুনে একবার চোখ তুলে তাকিয়ে দেখলেন, বেচারা কাগজওয়ালা তখনও দাঁড়িয়ে।

"বাড়তি দুটো কাগজ হবে?"—প্রশ্ন করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা।

"এখন তো হবে না হুজুর," লোকটি সবিনয়ে নিবেদন করল। "আধ ঘণ্টার মধ্যে এনে দিতে পারি। দুখানা চাই?"

"তাহলে পাঁচখানাই এনো।"

বালকৃষ্ণ আহুজা কাগজখানা হাতে নিয়ে গাছতলায় ফিরে যেতে দেখলেন, পা কাঁপছে। মনে মনে হাসলেন। আমি দেখছি বেশ

উত্তেজিত হয়ে পড়েছি ! উত্তেজিত হওয়া আমার বারণ। আবার রক্তের চাপ বেশি বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়বার ষ্ট্রোক হলে আর হয়ত বাঁচব না। তবু আজকের উত্তেজনাটা তাঁর ভাল লাগল। এ যেন তারুণ্যের উত্তেজনা; প্রথম প্রেমের উত্তাপ! বিদ্রোহ ও প্রেমের উৎস কি এক? বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ আহুজাকে অভিনন্দন জানাতে গিয়ে আই. সি. এস বালকৃষ্ণ আহুজার মুখে বক্র হাসি ফুটল। যেন শুনতে পেলেন সে বলছে, বড় দেরী হয়ে গেল।

চেয়ারে বসে প্রবন্ধ পড়লেন। খুশী-মনে প্রশংসা করলেন 'ইউলিসিস্ ওল্ড'-এর। তার প্রত্যেকটি যুক্তি অকাট্য; তথ্য ও পরিসংখ্যানের সমাবেশ কুশলী সেনাপতির সৈন্য-সমাবেশের মতই দুর্লঙ্ঘ্য। প্রবন্ধের ভাষাও চমৎকার; উষ্মাহীন, বিনীত, কোমল। পুরো তিন কলম বিস্তৃত প্রবন্ধ; আগাগোড়া প্রাঞ্জল, সুখবহ। আভিজাত্য বেড়েছে সম্পাদকীয় নিবন্ধে, যাতে প্রবন্ধে বক্তব্যের অকুণ্ঠ প্রশংসা ও পূর্ণ সমর্থন।

যৌবনে বালকৃষ্ণ আহুজার বড় সাধ ছিল ইঞ্জিনীয়র হবেন। কিন্তু কর্মজীবনে নির্মাতা না হ'য়ে শাসক হলেন। অবশ্য সুযোগ পেলেই তিনি নির্মাণ করেছেন—স্কুল, পুল, টাউন হল, হাসপাতাল। ড্রয়িং করেছেন নিজে, অধস্তন সরকারী ইঞ্জিনীয়ররা সোৎসাহে মেনে নিয়েছে। বালকৃষ্ণ আহুজার আসল নেশা হয়ে দাঁড়াল ভারতবর্ষের নদ-নদী ও প্রাকৃতিক সম্পদ্। পড়ে, পরিদর্শন ক'রে, পারদর্শীদের সঙ্গে ব্যাপক আলোচনায় তিনি এ দুটো বিষয়ে দস্তুরমত বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলেন। তাঁর কর্মস্থান যে প্রদেশে তার এমন কোনও নদী-নালা নেই, যার নাড়ী-নক্ষত্র বালকৃষ্ণ আহুজা না জানেন। কোথায় কোন পার্বত্য অঞ্চলে, কোন অনধ্যুষিত জঙ্গলে কি পরিমাণ খনিজ দ্রব্য লুক্কায়িত, তা নিয়ে বালকৃষ্ণের অনেক মৌলিক আন্দাজ ছিল; সেগুলিকে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন। ইচ্ছে ছিল, কেন্দ্রীয় সরকারে যোগ দিয়ে ভারতবর্ষের নদ-নদী শাসনে সারা জীবনের সুদীর্ঘ অনুশীলন একদিন কাজে লাগাবেন। সে ইচ্ছেও পূর্ণ হল না। প্রাদেশিক সরকারেই

বালকৃষ্ণ আহুজার কর্মজীবন শেষ হতে চলল। এবং, শেষ হবার আগে ঘটল জীবনে প্রথম নাটকীয় সংঘাত।

একটা নদী-শাসন পরিকল্পনা তৈরীর ভার পড়েছিল বালকৃষ্ণের ওপর। খুশি হয়ে তিনি এ ভার গ্রহণ করেছিলেন। নদীটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় গভীর, ঘনিষ্ঠ, দীর্ঘ। পত্নী কমলার চেয়েও যেন একে তিনি বেশি জানেন। বাঁধ-পরিকল্পনা তৈরীর আগে তিনি যত্ন ও শ্রমের কার্পণ্য করেন নি। পুঁথি-পত্র পড়া ছাড়া বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, প্রয়োজন মত বিদেশ থেকে জটিল বিষয়ে মতামত আনিয়েছেন। যে পরিণত খসড়া তিনি দাখিল করেছেন, বৈজ্ঞানিক, আর্থিক ও সামাজিক দিক্ থেকে তা নিখুঁত।

নিখুঁত বলেই সংঘাত বাঁধল। বালকৃষ্ণ আহুজার শঙ্কিত চোখের সামনে সে খসড়ায় ভেজালের আক্রমণ শুরু হ'ল। এমন সব সংশোধন গৃহীত হ'ল যার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। প্রতি স্তরে বালকৃষ্ণ বাধা দিলেন, তাঁর প্রতিরোধ দে'খে বিস্মিত সহকর্মীরা তাঁকে নিরস্ত করতে বার বার চেষ্টিত হল। অনেক ল'ড়েও তিনি হারলেন। দেখতে পেলেন, সিভিল সারভেন্টদের মধ্যে 'কর্তার-খুশিতে-কর্ম' ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়েছে। যা শুনলে উপরিওয়ালা হয়তো খুশী হবেন না, তা কেউ বলতে চায় না; যা প'ড়ে তিনি বিরক্ত হবেন মনে হয়, তা কেউ লিখতে চায় না। যে বাঁধ-পরিকল্পনা বালকৃষ্ণ অনেক পরিশ্রমে তৈরী করেছিলেন তার পরিবর্দ্ধিত, পরিশোধিত রূপ তাঁকে পীড়িত করল।

কিন্তু হেরেও তিনি হার মানতে চাইলেন না। আত্মা তাঁর বিদ্রোহ ক'রে উঠল।

এক সপ্তাহ খেটে বিদ্রোহের ইস্তাহার রচনা করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা।

সহরের সেরা সংবাদপত্রের সম্পাদক অনেক দিনের বন্ধু। তাঁকে বাড়ীতে আহারে আমন্ত্রণ করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। আহারের পর চলল দুঘণ্টা ব্যাপী গোপন আলোচনা। ইস্তাহার দে'খে সম্পাদক

বিস্মিত হলেন, পাঠ ক'রে আনন্দিত। বললেন, "লেখাটা ত চমৎকার। কিন্তু ফলাফল ভেবে দেখেছ ?"

"চুয়ান্ন বছর চলছে। আর বাকি এক বছর। তার মধ্যে আট মাস ছুটি পেতে পারি।"

"চাইলে, রিটায়ার ক'রেও, ভাল কিছু একটা পেতে পারতে।"

"দরকার নেই। গ্রামে গিয়ে চাষ করব ভাবছি।"

"পলিটিক্স ক'রো। অবসরপ্রাপ্ত বড় অফিসারদের রাজনীতিতে হাত পাকানো উচিত।"

"দেখো, আমার নামটা যেন কেউ না জানতে পারে।"

"সে আমি সামলে নেব।"

"এই বুড়ো বয়সে বিদ্রোহের মানে কি ? কী হবে একটা প্রবন্ধ ছাপিয়ে ?"

"সারাটা জীবন মান নিয়ে কাজ করেছি। আজ নিজের কাছে বড় অপমানিত লাগছে। ওটা আমার জবানবন্দী। বিধাতার আদালতে একেবারে যে হারি নি তার প্রমাণ।"

"আগামী রবিবারে ছাপব। দেখি, একটা সম্পাদকীয়ও লিখতে পারি কিনা। তাতে প্রবন্ধের মান বাড়বে।"

পরবর্তী দিনগুলি এক অভিনব অভিজ্ঞতায় কাটল বালকৃষ্ণ আহুজার। তিনি দেখতে পেলেন, তাঁর অন্তর জুড়ে ব'সে আছে বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ। রহস্যময় তার প্রভাব। সে নতুন স্বপ্নের স্বাদ এনে দিল। অজ্ঞাত, আকর্ষণীয় জীবনের তাপ লাগল অন্তরে। নিজেকে নবীনরূপে দেখতে পেলেন ভারতবর্ষের ঘটনাবহুল রঙ্গমঞ্চে। তিনি নন, তাঁর দেহে সেই বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ। সে লড়ছে, লড়ছে, লড়ছে। তার শত্রু শুধু এক : ভেজাল। যে-ভেজাল জীবনে বন্যার মত প্রসারিত। খাদ্যে, ঔষধে, চিন্তায়, আদর্শে, লক্ষ্যে, কর্ত্তব্যে। এ সবের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ। কোনও মত নিয়ে নয়, কোনও পথ নিয়ে নয়। শুধু একটি দাবী নিয়ে : নির্ভেজাল

হবার দাবী। ধনতন্ত্রই কর আর সমাজতন্ত্রই কর, নির্ভেজাল হও। ডান পথেই চল, বাঁ পথেই চল, বা মধ্যপথ বেছে নাও, নির্ভেজাল হও। তোমাদের মনন, কর্ম, সাফল্য, ব্যর্থতা সব নির্ভেজাল হোক। রাজনীতি কর ভেজাল না মিশিয়ে। অর্থনীতি কর নির্ভেজাল হয়ে। এই হ'ল বিদ্রোহী বালকৃষ্ণের মন্ত্র। তার সংগ্রাম আত্মপ্রতারণার, পর-প্রবঞ্চনার বিরুদ্ধে। সে রোজ সংবাদপত্রে তার প্রাণের প্রদাহ নিবেদন করছে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধে; পাঠ ক'রে মানুষের চোখ খুলছে, মন খুলছে। জনসাধারণ তাকে যেচে এসে নির্বাচন করেছে পার্লামেণ্টে, যেখানে সুবিনীত ভাষায়, অকাট্য যুক্তিতে বার বার সে শুধু সবকিছুর ভেজাল দেখিয়ে দিচ্ছে; মিনতি করছে, নির্ভেজাল হও।

বালকৃষ্ণ আহুজা বুঝলেন, এ তাঁর দিবাস্বপ্ন; বুঝে লজ্জিত, সংকুচিত হলেন। কিন্তু অন্তরস্থ বিদ্রোহীকে সযত্নে লালন না ক'রে পারলেন না। অনেক দিবাস্বপ্ন, অনেক কল্পনায় তাকে পুষ্ট ক'রে তুললেন। দেখলেন, অবসর পেলেই তার সঙ্গে কথপোকথনে মগ্ন হয়ে যান। কথা বলতে ভাল লাগে, নেশা লাগে। সুযোগ পেলেই সে আঙ্গুল দিয়ে তাঁকে ভেজাল দেখিয়ে দেয়।

কাজ করতে করতে সহসা টের পান, সে বিদ্রোহী কথা বলছে।

বলছে, এই দেখ, এটা ভেজাল; সত্য ও মিথ্যার খিচুড়ি।

বলছে, তুমি এগুলি যা লিখলে তা ঠিক নয়। ন্যায়ের মুখোস পরিয়ে অন্যায়কে সাজালে।

বলছে, এই যে লোকটাকে তুমি অত সম্মান দিলে, এ ভয়ানক ভেজাল; সন্ধান করলেই জানতে পারবে, কত গলদ এর জীবনে।

বালকৃষ্ণ আহুজার কর্মযোগে শিথিলতা এল। দু-একবার উপরিওয়ালার কাছে মৃদু তিরস্কার পেলেন। "জেনে-শুনে তুমি এসব কী লিখেছ?"

উত্তরে ব'লে ফেললেন, "জানি ব'লেই ত লিখেছি?"

শুনতে পেলেন বিরক্তির কণ্ঠ : "তুমি কি বুড়ো বয়সে বিদ্রোহী হলে? যাও, নতুন ক'রে লিখে নিয়ে এসো।"

রবিবারে প্রবন্ধটি ছাপা হ'ল। বার বার পাঠ ক'রে বালকৃষ্ণ আহুজা পরিতৃপ্ত হলেন। বিদ্রোহী বালকৃষ্ণ চেঁচিয়ে উঠল, "আমি জিতলাম।"

বালকৃষ্ণ আহুজা বললেন, "এবার তুমি হারবে।"

প্রায় প্রতি রবিবারেই দপ্তরে যান, আজ আর গেলেন না। সামনের বারান্দায় আরাম কেদারায় গা এলিয়ে বসলেন, কোলে গ্রাহাম গ্রীণের উপন্যাস। পড়তে গিয়ে দেখলেন, চোখের পাতা ভারী হয়ে আসছে। অন্তরের উত্তাপ দেহের ক্লান্তির সঙ্গে মিশে বিচিত্র অবস্থার সৃষ্টি করল। মনটা যেন কিসের অপেক্ষায় মুহূর্ত গুণতে লাগল।

টেলিফোন বাজল; বালকৃষ্ণ আহুজা চমকালেন। সাধারণতঃ তিনি টেলিফোন ধরেন না, আজ বড় বড় পা ফে'লে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুললেন।

মন যাঁর প্রতীক্ষায় মুহূর্ত গুণছিল তাঁর ভারী কর্কশ কণ্ঠস্বর অপর প্রান্তে শোনা গেল :

"গুড্ মর্ণিং আহুজা।"

"গুড্ মর্ণিং, রাও।"

"—কাগজে প্রবন্ধটা দেখেছ?"

"না ত? এখনও কাগজই খুলি নি।" নির্বিকার কণ্ঠস্বর বালকৃষ্ণ আহুজার।

"দেখ নি এখনো? সর্বনাশ! এ প্রবন্ধ লিখল কে?"

"কিসের প্রবন্ধ? কোন্ বিষয়ে?"

"তা নিজেই দেখতে পাবে! এক কাজ কর। প্রবন্ধটা প'ড়ে নাও। তারপর দশটায় আমার এখানে চ'লে এস।"

"একটা সিনেমার টিকেট কাটা ছিল!" করুণ স্বর আমদানী করলেন আহুজা।

"রাখ তোমার সিনেমা", ও প্রান্তে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণতর হ'ল। "এখানে দক্ষযজ্ঞ লেগে যাচ্ছে। একটু আগে প্রজেক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যান ফোন্ করেছিলেন। আমিও, তোমার মত কাগজ পড়ি নি। ক্রিসেন্থিমাম-গুলো 'পট' করছিলাম, এমনিতেই দেরী হয়ে গেছে, একটা রবিবারের সকালও খালি পাই নে। উনি ত রেগে আগুন। ধারণা, যা মনে হ'ল, তুমিই বেনামীতে প্রবন্ধটা লিখেছ।"

"আমি? বেনামীতে?"—হাসি চেপে আকাশ থেকে পড়লেন আহুজা। "হোয়াট এ্যান্ আইডিয়া! আমি কেন বেনামীতে লিখতে যাব?"

"আমিও তাই বলেছি। আচ্ছা, প্রজেক্ট নিয়ে তুমি কাউকে কিছু বল নি ত?"

"এমন নিশ্চয় কিচ্ছু বলিনি, যা বলা উচিত নয়।"

"আচ্ছা। তুমি এসে যাও। তারপর বাকী কথা হবে।"

টেলিফোন নামিয়ে বালকৃষ্ণ আহুজা টের পেলেন, দেহ অস্থির। কান, চোখ, মুখ তেতে উঠেছে। আর মনের মধ্যে লুকানো বিদ্রোহী হেসে লুটোপুটি খাচ্ছে।

সেক্রেটারী রাও সাহেবের বাংলোয় বালকৃষ্ণ আহুজা এসে হাজির হলেন ঠিক দশটায়। তুজনের মোটামুটি বন্ধুত্ব আছে। রাও সাহেব আহুজাকে নিয়ে দপ্তর-ঘরে বসালেন। তুজনে নিজস্ব সিগারেট বার ক'রে এক জ্বলন্ত কাঠিতে জ্বালালেন। তারপর শুরু হ'ল তাঁদের গুরুতর আলোচনা:

"প্রবন্ধটা পড়েছ?"

"পড়লাম।"

"কি মনে হ'ল প'ড়ে?"

"সুলিখিত, সুযুক্তিপূর্ণ।"

"কী বললে ?"

"তথ্যের সমাবেশ জোরাল। দৃষ্টিকোণ বৈজ্ঞানিক। মূল বক্তব্য অকাট্য।"

"কী সর্বনাশ। তাহ'লে কি তুমিই—"

"না। আমি ওটা লিখিনি। আমি হ'লে ওরকম ক'রে লিখতাম না।"

"চেয়ারম্যান কিন্তু ভয়ানক চটেছেন।"

"চটবারই কথা।"

"তাঁর ধারণা ভেতর থেকে সাহায্য না পেলে এ ধরণের হাটে-হাঁড়ি-ভাঙ্গা অসম্ভব।"

"অনুমান মাত্র। দেশে বুদ্ধিমান্ লোকের অভাব আমরা যতটা মনে করি ততটা নেই।"

"তুমি দেখছি ব্যাপারটা হাল্কা ক'রে দেখতে চাইছ।"

"সংবাদপত্রে ত কত লেখাই ছাপা হয়। তা নিয়ে বেশী মাথা ঘামালে রাজত্ব চলে না।"

"এ কেসটা যে তা নয় সে তুমি বিলক্ষণ জান। পঁচিশ কোটি টাকা খরচ হবে, জনসাধারণের টাকা—"

"সেটাই ত সুবিধে। জনসাধারণের টাকা মানে কারুর টাকা নয়!"

"আজ তোমাকে বড্ড বেশী হাল্কা-মেজাজ মনে হচ্ছে। এটা কৌতুকের বিষয় নয়। ব্যাপারটা এখানেই থামবে না। এ নিয়ে বিধান সভায় প্রশ্ন হ'তে পারে।"

"হ'লে তার উপযুক্ত জবাবও দেওয়া যাবে।"

"কে দেবে ?"

"যে সর্বদা দিয়ে থাকে! আমরা।"

"যে-সব সমালোচনা করা হয়েছে, সেগুলো সবই যে ভয়ানক সত্য।"

"তাহলে সেগুলো গ্রহণ করে প্ল্যান বদ্‌লে দেওয়া যাক।"

"অর্থাৎ, তোমার মৌলিক প্ল্যানই বজায় থাকুক!"

"নয়ত, সমালোচনার উপযুক্ত জবাব দেওয়া হোক।"

"তোমাকে যথেষ্ট সীরিয়স মনে হচ্ছে না।"

"রবিবারের সকালে, নগদ-পয়সায়-কেনা সিনেমার টিকেট নষ্ট করে সংবাদপত্রে-ছাপা একটা প্রবন্ধ নিয়ে অতিরিক্ত সীরিয়স হতে পারছি না।"

"দেখ, আহুজা। বিচক্ষণ ও সুদক্ষ হয়েও তুমি যে সেক্রেটারী হ'তে পারলে না, তা শুধু একটা গুণের অভাবে। তুমি বড় একগুঁয়ে। তাই 'জয়েন্ট' হয়েই হয়ত তোমায় অবসর নিতে হবে। তুমি আমার বন্ধু। তোমাকে উপদেশ দি। জীবনে তিনটে স্থির-সত্য আমি গ্রহণ করেছি; তার জোরে আমার যা কিছু প্রতিষ্ঠা। কর্তার ইচ্ছেয় কাজ করবে। কোন কাজ তাড়াতাড়ি করবে না। প্রত্যেকটা ঘটনাকে সংকটের গুরুত্ব দেবে।"

"থ্রি পিলর্‌স্ অব্ উইজ্‌ডম্।"

"তা বলতে পারো। ভাবলেই প্রত্যেকটি মূলনীতির তাৎপর্য বুঝবে। কর্তা যা চান তা করা আমাদের ধর্ম। নীচের মহলের প্রস্তাব যত সহজে অগ্রাহ্য, ওপর-মহলের প্রস্তাব তত সোৎসাহে গ্রাহ্য। তোমার আদর্শ, কর্তাকে খুশী রাখা; কর্তা খুশী, ত দুনিয়া খুশী। আর দেখ, কোন কাজ যদি চটপট ক'রে ফেল তাহলে তার গুরুত্ব ক'মে যাবে। বিশেষ জরুরী কাজ অবশ্যই চট ক'রে করিয়ে নিতে হয়, কিন্তু তাতে এত বেশী লোককে এমন তারা দিয়ে এত বেশী সময় নিযুক্ত করবে যাতে কর্তা বুঝতে পারেন, কাজটা কত ভারী এবং কি অল্প সময়ে তুমি তা হাঁসিল করেছ। আমার তৃতীয় মূলনীতি দ্বিতীয়েরই পরিব্যাপ্তি। কোন কিছুকেই হাল্‌কা মনে গ্রহণ করবে না; সর্বদাই দেখাতে হবে, কী বিরাট ভার তুমি অহরহ বহন করছ, অথচ তোমার কাঁধ সোজা, মেরুদণ্ড স্থির। সর্বদাই তুমি

গভীর চিন্তায়, মননে নিমগ্ন; প্রত্যেকটি সামান্যতম বিষয়ে তোমার দৃষ্টি সজাগ। দিনরাত সংকট সামলাতে সামলাতে তুমি সংকটত্রাতা হয়ে গেছ, মন্ত্রী মশাইয়ের তোমাকে ছাড়া একদণ্ড চলে না। এসব হ'ল সার্থক সচিবের কর্মবেদ। আমি মাঝে মাঝে কি ভাবি জানো? রিটায়ার করার পরে একটা বই লিখব,—হাউ টু বি অ্যান্ আইডিয়েল এ্যাড্মিনিষ্ট্রেটর্।"

"খুব ভাল হবে", আহুজা সায় দিলেন। "চাই কি, বড় কারুর ভূমিকা পর্যন্ত পেয়ে যেতে পারো।"

"সে এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু এখন তোমার এই রচনাটা নিয়ে কি করা যায়?"

"আমার রচনা মানে?"

"আহা, চটো কেন? তোমার রচনা মানে, তোমার বিভাগীয় রচনা। অর্থাৎ, এর ঝক্কি পোহাতে হবে তোমাকেই।"

"আগে পুল আসুক, তবে ত পার হব।"

"চেয়ারম্যানকে কি ব'লে বোঝাব?"

"তা তুমিই বিলক্ষণ জান। শুধু এটুকু ব'লো, আমি ওটা লিখি নি।"

"ঠিক বলছ ত?"—আহুজার ভুঁড়িতে টোকা মেরে রাও সাহেব জিজ্ঞেস করলেন।

করমর্দনের সুযোগে জবাবটা উচ্চারণ করলেন না বালকৃষ্ণ আহুজা।

এবার একটি একটি ক'রে পুল আসতে লাগল। পরের দিন প্রজেক্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের গৃহে তলব হ'ল আহুজার। তিনি যত প্রশ্ন করেন আহুজা তত বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, ক্রুদ্ধ হ'ন একটি প্রথম শ্রেণীর পত্রিকার এ-জাতীয় দায়িত্বজ্ঞানহীনতায়। চেয়ারম্যান যখন বললেন, চেষ্টা ক'রেও প্রবন্ধকারের পরিচয় উদ্ধার করতে পারেন নি, আহুজা উষ্মার সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন, গণতন্ত্রে সম্পাদক-শ্রেণীর মান ও

অহংকার কী অসম্ভব বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। চেয়ারম্যান বললেন, বিধান-সভায় প্রশ্ন হলে কী করা যাবে? আহুজা আশ্বস্তি দিলেন, সে ভার তাঁর নিজের।

এর পর চলল বালকৃষ্ণ আহুজার আত্মরক্ষা। বিদ্রোহী বালকৃষ্ণকে তিনি শক্ত করে শাসন করলেন; লেজ গুটিয়ে সে পালাল। এক সপ্তাহ পরিশ্রম ক'রে বালকৃষ্ণ আহুজা বৃহৎ একটি নিবন্ধ তৈরী করলেন। ইউলিসিস্ ওল্ড-এর প্রত্যেকটি বক্তব্য তাতে টুকরো টুকরো ক'রে কাটা হ'ল। অনুমোদিত পরিকল্পনার নিখুত কল্যাণকামী, বিজ্ঞান-পুষ্ট আকৃতি ও প্রকৃতি বিশদভাবে তিনি ব্যাখ্যা করলেন। বালকৃষ্ণ আহুজা বাহবা পেলেন কর্তাব্যক্তিদের। তাঁর তৈরী নিবন্ধ সামনে রেখে মন্ত্রী বিধানসভার বিরোধী দলের সমালোচনা নস্যাৎ ক'রে দিলেন।

দিন পনেরর মধ্যে উত্তেজনা থেমে গেল। বালকৃষ্ণ আহুজার বয়স বেড়ে গেল যেন পাঁচ বছর। কাজে মন বসে না। দেহ মন ক্লান্ত। বড় বেশী ঘুম পায়। মাথায় কেমন একটা ভার লেগে থাকে।

দীর্ঘ ছুটির আবেদন করলেন বালকৃষ্ণ আহুজা।

ক'দিন ধরে একটা ফাইল টেবিলের ধারে প'ড়ে ছিল। ছুটিতে যাবার আগের দিন বালকৃষ্ণ আহুজা সেটাকে টেনে সামনে আনলেন। ময়লা, সস্তা ফিতে খুলে কাগজগুলির ওপর চোখ রাখতে ঘুমে দৃষ্টি ভারী হয়ে এল। আধ-ঘুমন্ত আহুজা পাতাগুলো পড়ে গেলেন।

ফাইলের জন্ম ইউলিসিস্-ওল্ড লিখিত প্রবন্ধ থেকে। প্রবন্ধটিকে কাগজ থেকে কেটে সযত্নে মোটা কাগজে আঠা লাগান হয়েছে। তারপর কেরাণী থেকে সেক্রেটারী পর্যন্ত বহু মানুষের মন্তব্য জ'মে তৈরী হয়েছে বড় আকারের ফাইল। প্রায় শেষ মন্তব্যের জন্য উপস্থিত বালকৃষ্ণ আহুজার টেবিলে।

পার্কার কলমটা শক্ত করে ধরলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। তারপর সজোরে বড় বড় হরফে লিখলেন "এ ব্যাপারটা মিটে গেছে। বলা

বাহুল্য—কাগজে ছাপা প্রবন্ধটি কোনও দুষ্ট, দুর্বুদ্ধি-প্রণোদিত অজ্ঞ লোকের লেখা। প্রবন্ধের বক্তব্য বৈজ্ঞানিক নয়, পরিসংখ্যান নির্ভুল ত নয়ই। মন্ত্রী মহাশয় বিধানসভায় প্রবন্ধটির প্রত্যেক যুক্তি খণ্ডন করেছেন, এবং যে অসদুদ্দেশ্য নিয়ে তা লেখা হয়েছিল তার উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন।"

লিখতে লিখতে আবার ঘুম পেয়ে গেল। টেনে টেনে নামটা সই করলেন।

হঠাৎ যেন ভূত দেখে আঁৎকে উঠলেন বালকৃষ্ণ আহুজা। ফাইলের হলদে কাগজে নিজের মৃত মুখের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলেন।

গভীর, নিস্তরঙ্গ নিদ্রায় মাথা ভেঙ্গে পড়ল বিবর্ণ হলদে কাগজের ওপর।

ঋষি

স্যার হরিশংকরলালের সপ্ততিতম জন্মদিবস।

খ্যাতিমান পুরুষ স্যার হরিশংকরলাল। সাধারণ স্তর থেকে একমাত্র নিজের নিষ্ঠায়, মেধায়, পরিশ্রমে সার্থকতার শীর্ষে আরোহণ করেছেন। সর্বত্র তাঁর সম্মান, খাতির, প্রতিপত্তি। প্রতিষ্ঠা তাঁর বহুক্ষেত্রে প্রসারিত। কিন্তু সবচেয়ে বড় সুনাম চরিত্রের। হীরার আসল মূল্য যেমন জ্যোতিতে, স্যার হরিশংকরলালের আসল সম্মান চরিত্রে। অর্থ, ক্ষমতা, প্রতিপত্তি কোনওটার অভাব তাঁর নেই। পদস্খলনের প্রলোভন প্রতি পদক্ষেপে সাজান রয়েছে। কিন্তু কোনও দিন সামান্য বিচ্যুতি তাঁর ঘটে নি। অসীম প্রাচুর্য্যের মধ্যেও তিনি নিরবিচ্ছিন্ন সংযম রক্ষা ক'রে চলেছেন। যে দেশে মানুষ ভোগ-বিমুখতাকে সব চেয়ে বড় সম্মান দেয়, সে-দেশে অনুগত ভক্তদের কাছে তিনি ঋষি হরিশংকরলাল।

আজ থেকে পঞ্চান্ন বৎসর আগে গুজরাট থেকে হরিশংকর নামে একটি দরিদ্র বালক উত্তর ভারতে চলে আসে। বাপ গরীব স্কুল মাষ্টার, ছেলে ম্যাট্রিক পাস করে জীবনের তাগিদে বেরিয়ে পড়ে। কানপুরে এসে দুচারদিন ঘোরাঘুরি করার পর একটা ইংরেজ কারখানায় টাইমবাবুর চাকরী পেয়ে যায়। বছর তিনেক চাকরী করার পর সে একদিন কাজে ইস্তফা দিয়ে বসল। মাস খানেকের মধ্যে দেখা গেল কারখানার রসদ জোগাবার ছোট খাট কনট্রাকটারি করছে। পাঁচ বছর যেতে না যেতে সে হয়ে উঠল একজন প্রধান কনট্রাকটার। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বাজারে নিজের ভাগ্য তৈরী ক'রে নিল। যুদ্ধ যখন শেষ হল, লালা হরিশংকরলাল তখন ধনী ব্যবসায়ী; চারটে কোম্পানীর ডাইরেক্টর, তিনটে কারখানার মালিক। নয়া

দিল্লী শহর তৈরী হবার সময় হরিশংকরলাল অনেকগুলি বড় বড় কনট্রাক্ট পেল। রাজস্থান থেকে লাল পাথর আনল, বিহার ও পাঞ্জাব থেকে কুলি-কামিন, মহীশূর থেকে স্ফটিক প্রস্তর। আরও আনল ইঁট, চুন, সুরকী, বালি, লোহা-লক্কড়। বেশ কিছু দপ্তর-বাংলো-বাসা তৈরীর কনট্রাক্টও সে জুটিয়ে নিল। এরই মধ্যে নয়া দিল্লীর অন্যতম রাজপথে তৈরী হল তার নিজস্ব অট্টালিকা, তা ছাড়া আরও তিনখানা বড় বাংলো বাড়া। বড়লাট যেদিন মহাসমারোহে ভাইস্‌রয়স্‌ হাউসে স্থানান্তরিত হলেন, হরিশংকরলালও সেদিক কানপুর থেকে বসতবাটি নয়া দিল্লীতে নিয়ে এল।

নতুন রাজধানীতে ইংরেজ সরকার অভিষিক্ত হবার চার বছর পরে হরিশংকরলাল নাইটহুড খেতাব পেয়ে স্যার হরিশংকরলাল হলেন।

এইতো গেল ঐশ্বর্য্য ও বৈভবের কথা। হরিশংকরলাল পরম সন্তোষের সঙ্গে বলে থাকেন, এবং তাঁর কথা মোটামুটি সত্য, যে জীবনে তিনি কারুর করুণা, বা সাহায্য, চান নি, পান নি। যা কিছু অর্জন করেছেন নিজের কর্ম শক্তিতে, বুদ্ধিতে, পরিশ্রমে, সৌভাগ্যে। যতটা সম্ভব কম মিথ্যাচার করেছেন। যেটুকু না হ'লে নয় তার চেয়ে বেশি বিলাসিতা করতে দেন নি নিজেকে। বেশভূষায়, আহারে-আরামে চিরদিন তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করে এসেছেন। কোনওদিন কোনও রমণীতে উপপত হন নি।

যৌবন কি ক'রে কেটে গেল টের পান নি স্যার হরিশংকরলাল। প্রতিষ্ঠা অর্জনের একটানা প্রচেষ্ঠায় কেটে গেল বছরের পর বছর। সেই যে গুজরাটের গ্রাম ছেড়েছিলেন পনের বছর বয়সে, প্রতিমাসে নিয়মিত টাকা পাঠিয়েছেন, কিন্তু আর কোনও দিন সে গ্রামে ফিরে যান নি। জীবন সংগ্রামের প্রথম বছরগুলিতে যাবার সময় হয়নি; প্রতিষ্ঠা পাবার পরে কেমন অভিমান হয়েছে স্বপ্রদেশের ওপর, যেখানে তাঁর প্রতিভা কারুর দৃষ্টি পর্য্যন্ত আকর্ষণ করে নি। যুক্তপ্রদেশের

উদার সমাজে তখন এমন মিশে গেছেন, নিজেকে আর বিশেষ করে গুজরাটী মনে হয় নি।

জীবনে অনেক কিছু করেছেন। কিন্তু বিয়ে করেন নি। বিয়ে করার সময় পান নি।

জীবনে শীত গ্রীষ্মের দ্রুত আবর্তনে বসন্তগুলি কেমন যেন হারিয়ে গেছে। যে বয়সে মনে দখিন হাওয়া বয়, ফুল ফোটে, অব্যক্ত আকুতিতে অন্তর অস্থির হয়ে ওঠে, সে বছরগুলি কেটে গেছে কানপুরের বড় বড় কারখানার জ্বলন্ত চুল্লীতে কাচামালের রসদ জোগাতে। রং ধরবার সময় পায় নি মন ; গরজ ক'রে ধরাবার মত আত্মীয়-স্বজনও সঙ্গে কেউ থাকে নি। তাছাড়া, হরিশংকরলালের অন্তরে কৈশোর থেকে নারীর প্রতি সহজাত বৈরাগ্য। কঠোর পরিশ্রম ও নিষ্ঠুর নিষ্ঠার রসদে সার্থকতার চাকা যখন জোর চলছে, তখনও কোনওদিন মনে হয় নি সুন্দরী কোমল কোন রমনী এসে কষ্টোপার্জিত সম্পদের অংশীদার হোক।

ব্যবসায়ে নেমে হরিশংকরলাল যত ধনী হয়েছেন তত অসৎ হন নি। একেবারে সৎ উপায়ে অবশ্য ব্যবসা চলে না। ব্যবসার গায়ত্রী হল মুনাফা ; মুনফা বাড়াতে হ'লে অনেককিছু করতে হয় নীতির নিরপেক্ষ মানদণ্ডে যা ঠিক উৎরোয় না। হরিশংকরলালের ঘি ও তেলের ব্যবসা আছে ; বহুল-প্রচারিত বিজ্ঞাপনে "সম্পূর্ণ খাঁটি" বিঘোষিত হ'লেও তার অর্থ যে "নির্ভেজাল" নয়, তিনি তা জানেন। ইনকাম ট্যাক্স এড়াবার জন্য তাঁর সুদক্ষ অফিসররা কি কি উপায় বেছে নেন, তাও তাঁর অজানা নয়। কিন্তু ব্যবসা-ক্ষেত্রে অন্য দশজন মালিকের চেয়ে হরিশংকরলাল নিজেকে বেশী সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ মনে করেন।

তাঁর স্ত্রীপুত্র পরিবার নেই বলেই হয়তো অনেক কিছু তিনি করতে পেরেছেন যা আর দশজন করেন নি বা করতে পারেন না। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলির দৈনন্দিন পরিচালনায় তিনি হস্তপেক্ষ করেন না।

প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানে জেনারেল ম্যানেজার সর্বেসর্বা। কর্মচারীদের তিনি ভাল বেতন দেন; বেতনের গ্রেড, প্রভিডেন্ট ফণ্ড, বোনাস, গ্রাচুইটি, ছুটি ইত্যাদি সুশৃঙ্খলায় ও সুবিবেচনায় নির্বাচিত। হরিশংকরলালের কারখানায় হরতাল হয় না। শ্রমিকদের য়ুনিয়নের সভাপতি জেনারেল ম্যানেজার নিজে। শ্রমিক রাজনীতিতে সুদক্ষ ওয়েলফেয়ার অফিসররা নানা কৌশলে আত্মঘাতী ভাবধারা থেকে শ্রমিকদের দূরে সরিয়ে রাখে। হরিশংকরলাল শ্রমিকদের সুখ-সুবিধায় কার্পণ্য করেন না। স্থায়ী কর্মচারীরা প্রত্যেকে কোম্পানীর বাসা পায়; তাদের জন্যে হাসপাতাল, স্কুল, সিনেমা সব কোম্পানী ব্যবস্থা করে। প্রত্যেক শ্রমিক কলোনীতে রোজ সন্ধ্যায় রামায়ণ পাঠ, কীর্তন প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠান হয়। প্রত্যেক কারখানার শ্রমিকদের জন্যে মন্দির ক'রে দিয়েছেন হরিশংকরলাল। কোম্পানীর খরচে সাধু-সন্ত-মৌলভী-মোল্লারা শ্রমিক কলোনীতে বাস করেন। এক কথায়, হরিশংকরলাল তাঁর সাত হাজার শ্রমিকদের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের ভার স্বেচ্ছায় স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন।

বলা বাহুল্য, দেশ স্বাধীন হ'বার পরে স্যার হরিশংকরলালের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা দুই-ই বেড়েছে। কারখানাগুলি পুরো দমে দিনরাত কাজ করছে। তারা যা উৎপাদন করে তাই বিনা ক্লেশে বিক্রী হয়। নতুন কল-কব্জা এনে প্রত্যেকটি কারখানার কর্মশক্তি বাড়ান হয়েছে। স্যার হরিশংকরলালের চারখানা বাংলো বাড়ীতে বিদেশীরা বাস করে; মোটা ভাড়া পান তিনি। উদ্যোগী, সার্থক, উদার-দৃষ্টি ব্যাবসায়ী হিসেবে সরকারী মহলেও তাঁর প্রভূত সম্মান। ছ' সাতটা সরকারী কমিটি, কমিশন, এ্যডভাইজরী কাউন্সিলের তিনি মেম্বর; তার মধ্যে দুটোর প্রেসিডেন্ট। শ্রমিকদের কল্যাণে তাঁর গভীর মনোনিবেশ মন্ত্রীদের প্রকাশ্য প্রশংসা পেয়ে থাকে। সরকার যখন খেতাবগুলি এক কলমের আঁচড়ে তুলে দিয়েছিলেন, স্যার হরিশংকরের দুঃখ ও রাগ হ'য়েছিল। কিন্তু দেখতে পেয়েছেন,

ব্যবহারিক জীবনে তিনি এখনও 'স্যার'-ই রয়ে গেছেন। উচ্চতম রাজপুরুষরাও তাঁকে স্যার হরিশংকরলাল বলেন।

সার্থকতার শিখরে পৌঁছে হরিশংকরলালের দৃষ্টি স্বাভাবিকভাবেই দিগন্তপ্রসারী হ'য়েছে। কয়েক বৎসর তিনি বিশ্বমানবের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড় চিন্তিত হ'য়ে পড়েছেন। পৃথিবী যে-ভাবে অন্ধের মত ধ্বংসের দিকে ছুটে চলেছে, মানুষ যে সর্বনাশা গতিতে ভোগী ও বস্তু-সর্বস্ব হ'য়ে উঠেছে তাতে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত না হওয়াই অস্বাভাবিক। হরিশংকরলাল পৃথিবীর বড় বড় দেশগুলি ভ্রমণ ক'রে দেখে এসেছেন ধর্ম-মাটি-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষ অন্ধকার থেকে আলোয় আসবার জন্যে ব্যাকুল, অথচ তার সম্মুখে পথের সন্ধান নেই। মনে হয়েছে, যেমন প্রত্যেক ভারতবাসীর মনে হ'য়ে থাকে, বিশ্ব-সংকটের এই চরম মুহূর্তে ভারতবর্ষের কিছু দেবার আছে, করবার আছে। চোখ বুজে স্যার হরিশংকরলাল দেখতে পেয়েছেন, সমস্ত পৃথিবী গভীর অন্ধকার, সে অন্ধকারে কোটি কোটি মানুষ অন্ধ কীটের মত কিলবিল করছে, আর একমাত্র ভারতবর্ষ থেকে একটি ক্ষীণ জ্যোতি নিঃসৃত হচ্চে। সে জ্যোতি, তিনি অনুভব করেছেন, বাড়ান সম্ভব, তা দিয়ে পৃথিবীকে উদ্ধার করা সম্ভব।

সেই থেকে স্যার হরিশংকরলাল বিশ্বমানবের কল্যাণে অনেকখানি সময় ও অর্থ উৎসর্গ করেছেন। তাঁর উদ্যানে নিখিল ভারত সনাতন ধর্ম সম্মেলন হয়েছে, বড় বড় দেশনেতারা, প্রধান প্রধান সাধু সন্তরা, তাতে অংশ নিয়েছেন। তাঁর আগ্রহে বিশ্বশান্তির জন্যে মাসাধিককাল শান্তি-যজ্ঞ হয়েছে। অর্থ দিয়ে তিনি দুজন প্রতিভাশীল সাধুকে য়ুরোপ-আমেরিকায় দূত পাঠিয়ে একবছর সংগঠনের পরে আন্তর্জাতিক ধর্ম সম্মেলন ভারতবর্ষে ডাকতে পেরেছেন। সম্মেলনের পরে সবাই তাঁর নামের সঙ্গে ঋষি শব্দটি জুড়ে দিয়েছে। হরিশংকরলাল আপত্তি করেন নি।

স্যার হরিশংকরলালের অট্টালিকায়, একতলায় প্রশস্ত বসবার

ঘরে, দিনরাত্রি হোমাগ্নি জ্বলছে। পৃথিবীর কল্যাণের জন্যে হোম। প্রতিদিন তিনজন সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ বেদ-উপনিষদ পাঠ করেন; দু'জন মৌলভী কোরান শরিফ থেকে আবৃত্তি করেন; একজন পাদ্রী এসে বাইবেল ব্যাখ্যা করেন। বহু জনসমাগম হ'য়ে থাকে। পুরো এক বছর হোম চলবে; স্যার হরিশংকরের নিশ্চিত বিশ্বাস পৃথিবীর অনেকখানি হিংসা এ হোমের আগুনে নির্বাপিত হবে।

হোম যখন ছ' মাস চলছে তখন শরতের এক শুভ প্রভাত স্যার হরিশংকরলালের সপ্ততিতম জন্মদিন ঘোষণা করল।

হরিশংকরলালের ব্যক্তিগত জীবনে বিলাসের বাড়াবাড়ি নেই। এত বড় বাড়ীতে তিনি একরকম একা। বাপ-মা বহুদিন বিগত। একটি মাত্র ছোট ভাই, তার সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই। একমাত্র বোন নিঃসন্তান বিধবা, তাকে এনে কাছে রেখেছেন। হরিশংকরের ব্যক্তিগত কাজকর্ম করবার জন্যে পুরাতন দুই ভৃত্য, দু'জন সেক্রেটারী, একজনের নিবাস এলাহাবাদে, অন্যজনের দিল্লীতে। একতলার কয়েকখানা ঘর জুরে নিজস্ব আপিস। দোতলায় দেশী-বিদেশী কায়দায় সাজান দুখানা প্রশস্ত অভ্যর্থনা-কক্ষ। দক্ষিণ প্রান্তে হরিশংকরের শোবার ঘর ও খাস দপ্তর। অনেক দিন থেকে তিনি একাহারী। প্রাতে শয্যাত্যাগের পর হরিশংকরলাল কিছুক্ষণ ধ্যান করেন। তারপর বাড়ীর প্রশস্ত লনে একঘন্টা হেটে বেড়ান। স্নান সেরে পূজায় বসেন। পূজার পর সামান্য ফল প্রসাদ পান। দশটা বাজতে খাস দপ্তরে হাজির হন। একটা পর্য্যন্ত কাজকর্ম করেন। এবার দু'ঘন্টা বিশ্রাম। পরে আবার ঘণ্টা তিনেক কাজ। সন্ধ্যেবেলা হরিশংকর আহার করেন। ন'টা বাজতে তাঁর শয়ন ঘরে বাতি নিভে যায়।

আজ প্রভাতে স্নান সারবার পর সাতজন সাধু স্যার হরিশংকরকে আশীর্বাদ করে গেছেন। চন্দনে চর্চিত তাঁর কপাল, গরদের পবিত্র বস্ত্রে শোভিত তাঁর তাম্রকান্তি সুঠাম দেহ। সকাল থেকে লোকের

শেষ নেই। ওপরে দেশী কায়দায় সাজান বসবার ঘরে বিশেষ আসনে তিনি বসেছেন, দলে দলে লোক এসে তাঁকে মালা দিয়েছে, পায়ের ধূলি নিয়েছে, চন্দন পরিয়ে দিয়েছে তাঁর কপালে! সবার মুখে একবাক্য শুভেচ্ছা : আপনি শতায়ু হোন; আপনার জন্যে নয়, মানুষের জন্যে, পৃথিবীর জন্যে। বিভিন্ন শহর থেকে তাঁর কারখানার বড় ছোট কর্মচারীরা এসেছে, শ্রমিক প্রতিনিধিরাও। রাজধানীর গণ্যমাণ্য মানুষরাও এসেছেন; এসেছে সংবাদ পত্রের রিপোর্টার, ফটোগ্রাফাররা; আর, স্যার হরিশংকরকে বিব্রত, ব্যস্ত ক'রে দলে দলে স্ত্রীলোক। সবাই এসে ঋষি হরিশংকরকে প্রণাম করেছে।

এর মধ্যে এক সময় সকলকে বিস্মিত, সচকিত, ত্রস্ত-ব্যস্ত ক'রে আবির্ভূত হয়েছেন রাষ্ট্রপতি। হরিশংকরলাল ছুটে এসে অভ্যর্থনা করেছেন, গদগদ কণ্ঠে বলেছেন, "এ কি আমার পরম সৌভাগ্য! এত বড় পুরস্কারের উপযুক্ত তো আমি নই, এ কেবল আপনারই স্বকীয় মহিমা।" উত্তরে শুনতে পেয়েছেন, "আপনি মহৎ, নির্লোভ কর্মবীর; এত বড় জীবনে কোন পদস্খলন হয় নি আপনার, সম্পদে বৈভবে থেকেও আপনি আজীবন ব্রহ্মচারী। আপনি শাতায়ু হোন—"

প্রভাত অপরাহ্নে পরিণত হল। প্রশস্ত সুসজ্জিত ঘরখানা নানাবর্ণ, নানাগন্ধ ফু'লে ভ'রে গেছে। স্যার হরিশংকরলাল এবার উঠলেন। অন্তরে তাঁর প্রশান্ত পরিতৃপ্তি। জীবনদেবতা আজ তাঁকে মুকুট পরিয়ে দিলেন। সারাজীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমের আজ মহান মর্য্যাদা পাওয়া গেল। এ নয় কেবল ঐশ্বর্য্যের দান! ধনী তো অনেক আছে, কে তাদের শ্রদ্ধায় স্মরণ করে? সারাজীবন যে স্যার হরিশংকরলাল ভোগে বিরত থেকেছেন, সাত্বিক জীবন যাপন করেছেন, আজ তার পুরষ্কার মিলেছে। রাষ্ট্রের প্রধানতম থেকে ক্ষুদ্রতম

মানুষের শ্রদ্ধাঞ্জলি ও শুভকামনা তিনি পেয়েছেন। এই-যে গভীর স্নেহ, তার উপযুক্ত কিছু তাঁকে জীবনের শেষ অধ্যায়ে ক'রে যেতে হবে। স্বাস্থ্য তাঁর অটুট; রোগের, অবসাদের চিহ্নমাত্র নেই; হয়তো আরও বহুদিন বাঁচবেন তিনি। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো অজ্ঞাত, কখন কি হ'য়ে যায় কারুর জানা নেই। এতবড় ব্যবসার একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে হবে, যাতে তাঁর অবর্তমানে সমান সাফল্যের সঙ্গে চলতে পারে। কিছুদিন ধরে ভাবছেন একটা ট্রাষ্ট গঠন করবেন। একদিন, আর বছর দশেক পরে, স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর সাম্রাজ্যশাসন থেকে অবসর নেবেন। যারা তাঁর ব্যবসা গড়ে তুলেছেন, সেই ম্যানেজার থেকে শ্রমিক, তাদের প্রতিনিধিদের ট্রাষ্টে সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য থাকবে। পৃথিবীর কোনও শিল্পপতি যা করেন নি স্যার হরিশংকরলাল তাই করবেন। সাম্রাজ্য প্রজার হাতে তু'লে দিয়ে প্রব্রজ্যা নেবেন।

ওপরে উঠে খাস দপ্তরে কিছুক্ষণ বসলেন। মনটা কেমন উদাসীন হ'য়ে উঠল। দেহে কেমন ক্লান্তি বোধ করলেন স্যার হরিশংকরলাল। এত বড় বাড়ীটা মনে হল নির্জন, শূন্য। ড্রয়ার খুলে ডায়ারির খাতা বার করলেন। আজ প্রভাতের অভিনব ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেন। তারপর শোবার ঘরে এসে বিছানায় বসলেন।

শরৎকালের সীমাহীন নীল আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা মেঘের অলস সঞ্চরণ। অনেক উঁচুতে, দৃষ্টির প্রায় বাইরে, দুএকটা পাখীও মেঘের সঙ্গে পাল্লা দেবার চেষ্টা করছে। শোবার ঘরের প্রশস্ত জানালা দিয়ে রাস্তার অনেকখানি দেখা যায়। নিউ দিল্লীর রাজপথ—ছায়া-ঘেরা, নিরালা। কিছুক্ষণ পর পর দুচার খানা গাড়ী, টংগা, স্কুটার চলছে। একটা গরুর গাড়ী চলে গেল মন্থর গতিতে। স্যার হরিশংকরলালের মন উদাস হয়ে রইল। একবার মনে হল জীবন বুঝি বড় নিঃসঙ্গ কেটে গেল। সুদূর অতীতে বাপ-মায়ের স্মৃতি আজ কেমন হঠাৎ উজ্জ্বল। অথচ জীবনের কর্মব্যস্ত বছর গুলিতে তাঁদের কথা ভাববারও সময় হয় নি। ভাইএর সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক নেই। মাঝে মধ্যে টাকা চায়,

পাঠিয়ে দেন। অকৃতদার ব'লে পরের পুত্র কন্যায় তাঁর কোনওদিন দুর্বলতা হয় নি। চান নি ভাইপো ভাইঝিদের এনে সম্পদের ভাগ দিতে। হাজার হাজার লোককে তিনি মানুষ করেছেন। তারা সব তাঁর সন্তান। একান্ত নিরুপায় না হ'লে কারুর ক্ষতি করেন নি। ম্যানেজারদের বার বার ব'লে দিয়েছেন, কর্মচারিদের প্রতি যথাসাধ্য উদার হ'তে। অবশ্য এই হাজার হাজার সন্তানদের মধ্যে কেউ তাঁর কাছের মানুষ নয়। কারুর মুখে তাকালে তাঁর অন্তর ব্যথিয়ে ওঠে না। কিন্তু যা পেয়েছেন, তার বেশি জীবনে তিনি কোনওদিন চান নি। কিছু না-পাওয়ার জন্যে নিজেকে বঞ্চিত মনে হয় না। তবু যেন মাঝে মধ্যে কেমন খালি খালি লাগে।

শোবার ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল। এ ফোন কতিপয় লোকের মাত্র জানা। ডাইরেক্টরীতে উল্লেখ নেই। স্যার হরিশংকরলালের একান্ত ব্যক্তিগত ফোন। এ নম্বর যাদের জানা তাদের অধিকার আছে যে কোনও সময়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলার। তাদের ফোন নিচের কর্মচারীরা সেন্সার ক'রে পাশ করবার সুযোগ পায় না।

হরিশংকরলাল জানলা থেকে মুখ সরিয়ে পালংকের অন্য ধারে এসে ফোন তু'লে বললেন, "কে?"

অন্যপ্রান্ত থেকে ভেসে এল: "প্রণাম ঋষিজি!"

চমকে উঠলেন স্যার হরিশংকরলাল। স্ত্রীলোকের কণ্ঠস্বর। বহুদিন আগে এ স্বর এত পরিচিত ছিল, যে আজও তিনি এক মুহূর্তে চিনলেন। চিনতে পেরে একটুও আনন্দ হল না তাঁর।

বললেন, "আপনি কে?"

"আমায় চিনতে পারছেন না?"

"নাম বলুন।"

"নাম ব'লে কি হবে? নাম তো জানেনই।"

অভিনয় ত্যাগ করলেন স্যার হরিশংকরলাল।

"আপনি কবে এলেন?"

"আমি তো এখন এ শহরেই আছি।"

"কবে থেকে?"

"কিছুদিন।"

"আজ হঠাৎ—?"

"হঠাৎ কেন! আজ তো সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছে। আমার কি অভিনন্দন করবার অধিকার নেই?"

"অভিনন্দনের কিছু নেই।"

অন্য প্রান্তের মহিলা মৃদু হেসে উঠলেন। স্যার হরিশংকরের মনে পড়ল একদিন বড় মিষ্টি ছিল এ কণ্ঠস্বর। সে অনেকদিন, অনেক, অনেক দিন আগের কথা। আজ কেমন কর্কশ, ভারী। মনে মনে বললেন, বয়স। সময় তার মাশূল কড়া হাতে কেড়ে নেয়।

"বলেন কি? আপনাকে অভিনন্দন করার কিছু নেই? এত বড় ব্যবসা, এত ঐশ্বর্য্য, এত সম্মান, প্রতিষ্ঠা। এমন নিষ্কলঙ্ক জীবন।"

অসহ্য লাগল স্যার হরিশঙ্করের। বলে উঠলেন, "আপনি এত বছর পরে এখনও আমাকে বিদ্রূপ করছেন?"

প্রান্তবর্তিনীর কানে পৌছল না তাঁর প্রশ্ন। তিনি বলে চললেন, "দেশের লোকে আপনাকে ঋষি বলছে। বৎসর ব্যাপী যে হোম করছেন তা শেষ হ'লে নিশ্চয় মহর্ষি বলবে।"

কঠিন হ'ল স্যার হরিশংকরের কণ্ঠস্বর।

"আমার কাছে কিছু দরকার আছে আপনার?"

"দরকার তেমন নেই। আপনার উপকারের কথা ভুলিনি। আজকে শুভদিনে শুভেচ্ছা জানাবার ইচ্ছে হল।"

"অনেক দয়া আপনার। টেলিফোন নম্বর কোথায় পেলেন?"

"পেয়ে গেলাম।"

খুব রাগ হল স্যার হরিশংকরলালের। তথাপি নিজেই আশ্চর্য্য হ'লেন নিজের প্রশ্ন শুনে।

"কোথায় আছেন?"

খলখল হাসি ভেসে এল অন্য প্রান্ত থেকে। "কেন? দেখা করতে আসবেন নাকি?"

"না।"—বেশ জোরের সঙ্গে বললেন হরিশংকরলাল।

"এসে কিছু লাভ নেই। আচ্ছা, চলি। নমস্তে ঋষি হরিশংকরলাল।"

এমন ভাবে শেষ তিনটি শব্দ উচ্চারিত হল, যার হরিশংকরলালের কানে যেন তিনটি জ্বলন্ত শলাকা ঢুকল। অস্থির অসহ্য উত্তেজনায় তিনি ফোন নামিয়ে রাখলেন।

অনেকদিন আগেকার কথা। হরিশংকরলাল তখন নতুন দিল্লীতে কণ্ট্রাক্টর। পথের, ইঁট, সুরকি, বালি, মজুর আমদানী করতে দিনরাত ব্যস্ত। এ সময় একজনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হ'য়েছিল। জয়পুরের মানুষ, দু-পুরুষ দিল্লীর বাসিন্দা। নাম রূপলাল রতৌরী।

চাঁদনী চকে রূপলালের দোকান। লোহা লক্করের ব্যবসা। রূপলালের সঙ্গে ব্যবসা সংক্রান্তে আলাপ ও যোগাযোগ হয়েছিল। অচিরে বন্ধুত্বে পেকে উঠেছিল তাদের সম্পর্ক।

হরিশংকরলাল তখনই বেশ ধনী। সৎলোক বলে খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। নিজের বলতে কেউ ছিল না, তাই অন্তরে স্নেহের আকাঙ্ক্ষা লুকিয়ে ছিল। রূপলাল সে আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি পূর্ণ করেছিল। শুধু রূপলাল নয়। তার সুন্দরী স্ত্রী লক্ষ্মীও।

দীর্ঘ পেশল গৌরবর্ণ দেহ রূপলালের। আর লক্ষ্মী যেন লক্ষ্মী প্রতিমা। অমন সুন্দর স্ত্রীলোক হরিশংকরলালের আগে চোখে পরে নি। যেমন সুন্দর, তেমন সুশ্রী, তেমন হাস্যময়ী, তেমন কোমল-কমনীয়। হরিশংকরলাল বন্ধুকে স্ত্রীভাগ্যের জন্যে অভিনন্দন করত। বন্ধুপত্নীকে স্বামীভাগ্যের জন্যে।

তারা বলত, "তুমি বল, আজই তোমাকে আরও সুন্দর বৌ এনে দেব।"

হরিশংকরলাল হেসে বলত, "তাহলে স্বর্গের উর্বশী আনতে হবে।"

সরমে রক্তিম লক্ষ্মী জবাব দিত, "তাই দেব। আপনি শুধু রাজী হোন।"

হরিশংকরলাল জবাব দিত, "দাঁড়ান। এই চুন সুড়কি ইঁট বালির মধ্যে বৌ রাখব কোথায়? আর একটু গুছিয়ে নিই।"

"গুছিয়ে নিতে নিতে যে জীবনে অপরাহ্ন এসে গেল!" লক্ষ্মী দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে বলত।

"মধ্যাহ্নের চেয়ে অপরাহ্ন অনেক বেশি উপভোগ্য", জবাব দিত হরিশংকরলাল।

রতৌরী পরিবারে সুখের অভাব ছিল। রূপলাল-লক্ষ্মীর সন্তান ছিল না। সন্তান লোভ ছিল যেমন রূপলালের, তেমন লক্ষ্মীর। রূপলাল কদাচিৎ তা প্রকাশ করত। লক্ষ্মী কদাচিৎ গোপন রাখত।

হঠাৎ একদিন রূপলাল পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হ'য়ে শয্যা নিল। কোমড় থেকে নিচের অর্ধাঙ্গ তার অবশ। নিজের যত কাজ থাক না কেন, হরিশংকরলাল বন্ধুর বিপদে এসে কাছে দাঁড়াল। তার ব্যবসা চালাবার ভার নিজের হাতে তুলে নিল। একজন বিশ্বস্ত লোককে দোকানের ম্যানেজার নিযুক্ত করল। রূপলালের আয় বাড়ল বই কমল না। কাজ থেকে কোনও মতে ছুটি নিয়ে হরিশংকরলাল রূপলালের খোঁজ খবর রাখত। ভাল ডাক্তার কবিরাজ লাগিয়ে চিকিৎসা করাত।

স্বামীর সেবায় লক্ষ্মীর নিষ্ঠা দেখে হরিশংকরলাল চমৎকৃত হ'য়েছিল। পঙ্গু স্বামীর যাবতীয় পরিচর্য্যা অকাতরে, অক্লান্তিতে লক্ষ্মী ক'রে যেত; রূপলালের খিটখিটে মেজাজে বিন্দুমাত্র উষ্মা বা বিরক্তি ছিল না তার। দুএকবার লক্ষ্মীকে হরিশংকরলাল বলেছিল,

নার্স রেখে দি। করুণ হাস্যে লক্ষ্মী জবাব দিয়েছিল, তাহ'লে আমার দিন রাত কাটবে কি নিয়ে?

রূপলালের রোগ হরিশংকরলালকে লক্ষ্মীর নিকটে নিয়ে এল। চিকিৎসার কথাবার্তা তাদের দুজনার মধ্যে। কেবল দুপুরে আহারের পর হরিশংকরলালের একটু অবসর মিলত। এ সময়ই বেশি দিন রূপলালের খবর নিতে আসতে পারত। মাঝে মধ্যে দেখত রূপলাল নিদ্রিত। তার ঘুম না ভাঙিয়ে অন্য ঘরে তারা বসত—সে আর লক্ষ্মী। কথা বার্তা রূপলালকে নিয়ে শুরু হত, কিন্তু রূপলালে সীমাবদ্ধ থাকত না। লক্ষ্মী নিজেদের কথা অনেক বলত, হরিশংকরলালের কথা শুনতে চাইত। জীবনে প্রথম এক কোমলহৃদয়া সুন্দরী নারীর সান্নিধ্যে এসে হরিশংকরলাল অভূতপূর্ব অনুভূতির আস্বাদ পেল। জীবনে আগে—বা পরে—এ অনুভূতি আর সে পায় নি।

লক্ষ্মীর কাছ থেকে অনেক সুখ-দুঃখের কথা তাকে শুনতে হয়েছিল। সে যে মা হ'তে পারে নি, এর চেয়ে বড় ব্যথা লক্ষ্মীর ছিল না। এ দুঃখের কাছে স্বামীর পঙ্গু হবার দুর্ভাগ্যও যেন ছোট হ'য়ে যেত। লক্ষ্মীই একদিন বলে ফেলেছিল, রূপলাল মনে করে সে বন্ধ্যা; কিন্তু তার ধারণা অন্য।

প্রথমটা হরিশংকরলাল বুঝতে পারে নি। তাকে চুপ দেখে লক্ষ্মী আরও বলেছিল, "আমি বলি, চলো দুজনেই ডাক্তার দেখাই। তাতে রেগে যান।"

বিশেষ কিছু না ভেবে হরিশংকরলাল প্রশ্ন করেছে, "কেন?"

"বুঝতে পারছেন না?" লক্ষ্মীর কণ্ঠস্বর কর্কশ, "তাহলে যে নিজের আসল অবস্থাটা ধরা প'ড়ে যাবে।"

এতক্ষনে হরিশংকরলাল বুঝতে পারল। রূপলাল সন্তানহীনতার জন্যে স্ত্রীকে দায়ী করে নিশ্চিন্ত। লক্ষী দায়ী করেছে স্বামীকে। লক্ষ্মীর ডাক্তারের কাছে যাবার সৎসাহস আছে, রূপলালের নেই।

লক্ষ্মীর প্রতি হৃদয়ে গভীর করুণা বোধ করল হরিশংকরলাল।

বঞ্চিতা এই সুন্দরী মেয়েটি দিনরাত নির্বাক নিষ্ঠায় পঙ্গু স্বামীর সেবা করেছে। স্বামীর কাছে নারী যা সবচেয়ে বেশি চায়, সে মাতৃত্ব, লক্ষ্মী পায় নি; উপরন্তু বন্ধ্যা অপবাদ মাথা পেতে নিয়েছে। করুণা ক্রমে মমতায় পরিণত হল। ভাল চিকিৎসা সত্ত্বেও রূপলালের কোনও উন্নতি হচ্চে না, বরং হার্টের অবস্থা খারাপ হ'য়ে আসছে! কিন্তু বাঁচবার আকাঙ্খা তাঁর ভয়ানক বেড়েছে। তার অনুরোধে হরিশংকরলালের বেশি আসতে হয়। কিন্তু অপরাহ্ণ ছাড়া তার সময় নেই। প্রায়ই এসে দেখে রূপলাল নিদ্রিত। লক্ষ্মীর সঙ্গে কথা বলতে অবশ্য ভাল লাগে; ভাল লাগে লক্ষ্মীর চলা-ফেরা, স্বামী-সেবা চুপ ক'রে দেখতে। লক্ষ্মীও হরিশংকরলালের কাছে এখন সম্পূর্ণ সপ্রতিভ। শুধু যে অনেক কথা সহজে বলতে পারে তা নয়, অনেক কিছু নিয়ে হরিশংকরলালকে সে ঠাট্টা পরিহাস, রস-রসিকতা ক'রে।

লক্ষ্মীর কথাবার্তায় যে এত ধার, হরিশংকরলাল আগে জানতে পারে নি। লক্ষ্মীর বাক্যে ঝিলিক লেগে যায়, সে মুগ্ধ হ'য়ে শোনে, দেখে।

সে হয়ত বলল, "খেটে খেটে ম'রে গেলাম বৌদি।"

লক্ষ্মী তক্ষুণি হেসে জবাব দিল, "মরলেন আর কোথায় শেঠজি! মারলেন।"

"সে আবার কি? কাকে মারলাম?"

"আপনার খাটুনি দেখে আমাদেরই মরতে ইচ্ছে হয়। আপনার নয়।"

"আমার নয়?"

"না শেঠজি। যদি সত্যি মরবার মত হত, খাটুনি বন্ধ ক'রে আরাম করতেন। পয়সার নেশায় পেয়েছে আপনাকে। অন্য কিছুর নেশা করুন না এক আধটু!"

"কিসের নেশা করবো বলুন?"

"আমাদের মত ছোটখাট মানুষকে নিয়ে শুরু করতে পারেন, শেঠজি। অবশ্যি তাতে আপনার মন ভরবে না।"

"ছি, ছি, কি যে বলেন আপনি বৌদি!"

"বৌদি ডাকেন তাই বলবার সাহস রাখি। আসল কথা, আপনি বিয়ে করুন।"

"ঐ তো আপনার এক কথা! বিয়ে করবার সময় নেই।"

"অসময়ে করুন।"

"হজম হবে না বৌদি।"

"হবে। হজমি গুলি আমি দিয়ে দেব।"

হঠাৎ এক সপ্তাহ হরিশংকরলাল এল না। এক অসহ্য অবরুদ্ধ বেদনায়, সংঘাতে সাতটা দিন তার কাটল। তারপর একদিন অপরাহ্নে যখন সে এল, রূপলাল তখন নিদ্রিত। লক্ষ্মী এমন অভিমান, স্নেহ, প্রীতির সম্ভার খুলে বসল, হরিশংকরলাল কেমন অভিভূত হ'য়ে গেল। তাকে বসবার ঘ'রে নিয়ে গিয়ে লক্ষ্মী অনেক কথা বলল, হরিশংকরলাল একটা কথাও শুনতে পেল না। বুকে কেমন কাঁপুনি, যেন ভূমিকম্প উঠল অন্তরের অন্তস্তলে। হাত পা কেমন অবশ। মুখ ফ্যাকাশে। বসেছিল দরজার কাছের চেয়ারে, হাত বাড়িয়ে দরজা ধরল। লক্ষ্মী কিছুক্ষণ পরে উঠে যাচ্ছে স্বামীকে দেখবার জন্যে, হরিশংকরলালের পাশ কাটিয়ে তার প্রস্থান, প্রবেশ। হরিশংকরলাল বিহ্বল বিবশ হ'য়ে তার সুন্দর দেহের মন্থর গতি দেখতে লাগল। পঞ্চমবার লক্ষ্মী যখন বাইরে যাবে, হরিশংকরলালের বুকে আবার ভূমিকম্প হল। থরথর কম্পিত বুকে দুখানা বিবশ হাতে লক্ষ্মীকে সে টেনে নিল।

বিস্মিত হল না লক্ষ্মী। শুধু গভীর কালো বড় বড় চোখে তাকাল হরিশংকরলালের দিকে। নিজেকে সঁপে দিল।

কোথা দিয়ে কেমন ক'রে কি হল হরিশংকরলাল টের পেল না। শুধু দেখল হাত পা বিবশ নেই, বুকে নেই কাঁপুনি; শুধু তার সমস্ত দেহ নিথর নিষ্পন্দ ভারী পাথর। সে পাথরে আগুন নেই। সে জ্বলে না। বোবা চোখে সে তাকিয়ে রইল লক্ষ্মীর জ্বলন্ত মুখে, পরম সুন্দর নিরাবরণ দেহে।

ঘৃণায় বিকৃত হল লক্ষ্মীর মুখ। যে দেহ একটু আগে মুহুর্মুহু কেঁপে উঠছিল, অতৃপ্ত অশ্লেষে তা বার কয়েক পাক খেল। মুখ থেকে চাপা একটা আওয়াজ আসছিল, দুতিন বার এখন গোঙানি শোনা গেল। ঝট্ ক'রে উঠে বসল লক্ষ্মী। প্রচ্ছন্ন ঘৃণার চোখে তাকাল নির্বোধ হরিশংকরলালের দিকে। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় বলে গেল, "তুমি তো ওঁর-ও অধম। ছিঃ ছিঃ।"

এ ঘটনার পর হরিশংকরলাল রূপলালের বাড়ী যায় নি। দোকানের ম্যানেজার মাসে মাসে টাকা দিয়ে এসেছে। বছর খানেক যেতে হরিশংকরলাল খবর পেল রূপলাল মারা গেছে। দোকান বিক্রী ক'রে সব টাকা লক্ষ্মীর কাছে পাঠিয়ে দিল। বিক্রী করাই ছিল লক্ষ্মীর ইচ্ছে।

একদিন লক্ষ্মী তাকে ডেকে পাঠাল। সন্ধ্যাবেলা হরিশংকরলাল এসে দেখল লক্ষ্মী যাত্রার জন্যে তৈরী। সে কাশী যাচ্ছে।

"আপনাকে ডেকে পাঠিয়ে ধৃষ্টতার কাজ করছি।"

হরিশংকরলাল চুপ ক'রে রইল।

"আপনি আমাদের জন্যে যা করেছেন তার তুলনা নেই। জীবনে একদিনের জন্যেও আপনার দয়া ভুলব না।"

হরিশংকরলাল কথা কইল না।

"আর একটা কাজ আছে, আপনাকে করতে হবে।

প্রশ্নবোধক দৃষ্টি তুলল হরিশংকরলাল।

"এ বাড়ীটা বেচতে চাই। আমার ঠিকানা আপনাকে দিয়ে যাচ্ছি। বাড়ীটা বিক্রী ক'রে আমার নামে টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দেবেন।"

"এ কাজ আমাকে কেন?"

"আর আমার এখানে বিশ্বস্ত বন্ধু কে আছে বলুন?"

হরিশংকরলাল তাকিয়ে দেখল লক্ষ্মীর চোখে জল। তার চোখের সামনে পৃথিবী আবার টলল। হরিশংকরলাল হাত বাড়িয়ে লক্ষ্মীকে ধরতে গেল।

দু'পা পিছিয়ে গেল লক্ষ্মী। কণ্ঠে বিদ্রূপ বেজে উঠল, "এতে তার দরকার নেই শেঠজি; ও সব আপনার দ্বারা হবে না।"

"আর একবার—"

"নিজেকে আপনি এখনও জানেন না, শেঠজি? আপনি—"

"কি? আমি কি?" কাতর কণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠল হরিশংকরলাল।

"আপনি সৎ লোক, শেঠজি। আপনি ভাল লোক। আপনি ধনী লোক। কিন্তু আপনি পুরুষ নন।"

টেলিফোন রেখে দিলেন স্যার হরিশংকরলাল। যে আকাশ

এক্ষুনি গভীর নীল ছিল, তাতে একখণ্ড কালো মেঘ জাঁকিয়ে বসেছে। সূর্য ঢাকা পড়েছে তার আড়ালে। হঠাৎ চতুর্দিক কেমন বিষণ্ন হ'য়ে উঠেছে। রাস্তা দিয়ে বিকট শব্দে ছুটো লরী চ'লে গেল। গাছের ডালে চিল ডাকছে। বাড়ীর সদর দরজার সামনে একটা ভিখারী বালক আছে দাঁড়িয়ে।

স্যার হরিশংকরলাল বিছানায় শুয়ে পড়লেন। হঠাৎ বড় ক্লান্ত মনে হল দেহমন। চোখ বুজলেন। অন্ধকার আলো ক'রে ভেসে উঠল সুন্দর একখানা মুখ। বিরক্ত হ'য়ে তাকে তাড়াবার জন্যে চোখ মেললেন স্যার হরিশংকর। চোখ পড়ল দেয়ালে ছুখানা ছবিতে। একখানার নীচে লেখা স্যার হরিশংকরলাল কে. টি। অন্যখানার নীচে ঋষি হরিশংকরলাল।

ফাঁকি? তা একটু আছে বৈ কি? জীবনে কোন জিনিষে ফাঁকি নেই? এমন প্রেম আছে যাতে বিতৃষ্ণা নেই? এমন বন্ধুত্ব আছে যাতে হিংসা নেই? মাতৃস্নেহে পর্য্যন্ত স্বার্থের ভেজাল। ইংরেজদের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে হরিশংকরলাল নাইট্ হতে পেরেছেন, এটাই সবচেয়ে বড় কথা হল? তাঁর এই এতবড় শিল্প-সাম্রাজ্য, মানুষের কল্যাণে আজীবন তাঁর প্রচেষ্টা, এত তাঁর খ্যাতি, সুনাম, এ সবই কি মিথ্যে? যে ভোগবিমুখতা তাঁকে ঋষিত্ব দিয়েছে, হোক না সে ভোগের অক্ষমতা, তবু সে তা মিথ্যে নয়। পুরুষ না হ'য়েও কি মহাপুরুষ হওয়া যায় না? এই যে তিনি এত নির্মান করেছেন, কলকারখানা, লোকালয়, স্কুল, হাসপাতাল, এর মধ্যে সার নেই? না হয় নেই তাঁর সৃজন-শক্তি, তবু তো তিনি নির্মাতা। এই যে ভারতবর্ষে নতুন সভ্যতা গড়ে উঠেছে, এত তার বৈভব, এত জাক-জমক, তার মধ্যে সৃজনশীলতা কোথায়? তার জন্যে কি সে সভ্যতা নয়?

নীচে থেকে অনুগতদের কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "ঋষি হরিশংকরলাল কী জয়।"

গভীর তৃপ্তিতে স্যার হরিশংকরলাল চোখ বুজলেন। চোখের পাতার চাপে ছু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু তাঁর গাল বেয়ে নেমে এল।

———